দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ২১ জুলাই - ২০১৪।। ৪ শ্রাবণ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com ।।

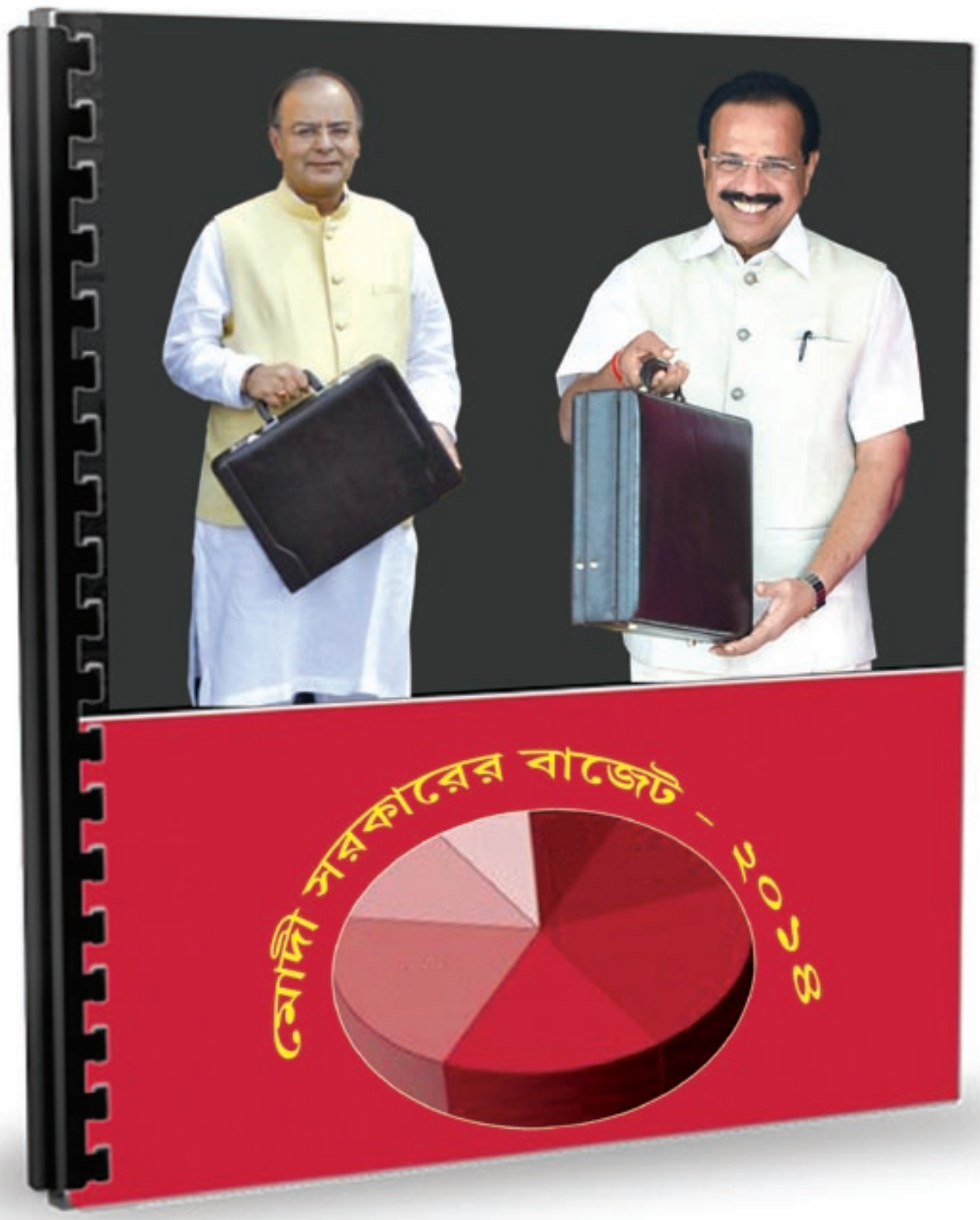

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

বেছে বেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর
হামলা চালানো হচ্ছে □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : নাটকের কল্যাণ হোক □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা □ কে. এন. মণ্ডল □ ১২

ব্যতিক্রমী রেলবাজেট : প্রত্যাশা এবং বিশ্লেষণ □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৪

কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের প্রথম সাধারণ বাজেট-২০১৪
এ যেন ভারত-যাত্রার অরুণোদয় □ এন. সি. দে □ ১৭

প্রাচীন ভারতে আজকের নলজাতক সন্তান □ নীতিন রায় □ ২১

পৌরাণিক নগর প্রভাস □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২৩

লোকসভায় কোনো দলেরই বিরোধী পদমর্যাদা পাওয়া
আইনত বৈধ নয় □ সুভাষ সি কাশ্যপ □ ২৭

ছিট বিনিময় হোক, কিন্তু শক্তিপীঠ বোদেশ্বরী মন্দির
বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়ে নয় □ সাধন কুমার পাল □ ২৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

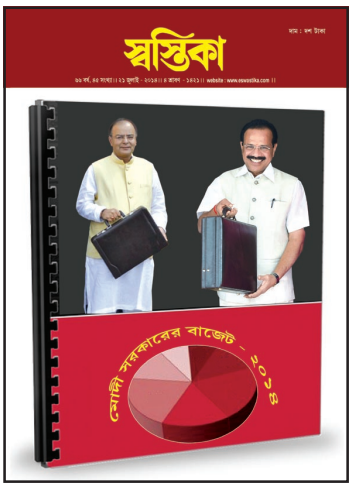

পৃঃ ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬ □
অন্যরকম : ৩৩ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭
□ রঙ্গম : ৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৬, ২১ জুলাই - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬
৮৬৯৭৫২১৪৭৯
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে ২৮শে জুলাই ২০১৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ২৮শে জুলাই ২০১৪

পঞ্চশীল— চীনের নীতি না মুখোশ ?

চীনের পঞ্চশীল নীতির ষাট বছর উপলক্ষে বেজিং-এ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারী। কিন্তু ভারত-চীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর্থিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ও সীমান্ত-বিবাদ— কোনোটারই সমাধান হয়নি বরং হয়ে উঠেছে গভীর চিন্তার বিষয়। প্রশ্ন উঠেছে— পঞ্চশীল চীনের নীতি না মুখোশ। এনিয়েই লিখেছেন মে: জে: কে. কে. গাঙ্গুলি, শুভাপ্রসন্ন মণ্ডল প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের বাজেট বিরোধিতা কেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের রেল বাজেট এবং সাধারণ বাজেটের বিরোধিতা করিয়া রাজ্যের তৃণমূল সরকার প্রবল আন্দোলন করিবার প্রস্তুতি লইতেছে। সংসদেও বিজেপি-র বিরুদ্ধে আগ্রাসী হইয়া তৃণমূল বিরোধিতা চালাইতেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সমালোচনা থাকিবে, আলোচনা চলিবে কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সর্বস্তরের বিরোধিতা কেন? এই বিরোধিতার মূল কারণ রাজনৈতিক। কেবল মুসলমান ভোট আদায় করিবার তাগিদেই এত বিরোধিতা। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার যে অভিযোগ করা হইতেছে তাহা সত্য নয়। বাম আমলের দেনা মিটাইতে গিয়াই রাজ্য নাকি সর্বস্বান্ত। ফলে রাজ্যে উন্নয়নের গতিতে টান পড়িয়াছে বলিয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত তিন বছর ধরিয়া অনুযোগ করিতেছেন। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থ দাবি করিতেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করিলেও রাজ্য সরকার সেই অর্থ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করিতে পারিতেছেন না কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হইবার পর আর্থিক বছরেই ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে অনুদান বাবদ কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত অর্থ ৫০ শতাংশও খরচ করিতে পারে নাই রাজ্য সরকার। পুর ও নগরোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতকে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাবদ দেওয়া হইয়াছিল ৪২০২ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার এই পর্যন্ত খরচ করিতে পারিয়াছে মাত্র ২২৩২ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৯৭০ কোটি টাকা এখনও খরচ করিতে পারে নাই। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ত্রাণ বাবদ ৭৩৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দের মাত্র ১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। সর্বশিক্ষা অভিযানে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ১২৫১ কোটি টাকার মধ্যে ৭৭১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। রাস্তা ও সেতু নির্মাণের ৩০৭ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্দের ২১২ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। রাজ্য বিধানসভায় ক্যাগের রিপোর্টে এই তথ্য মিলিতেছে। কেন্দ্রের টাকা খরচে রাজ্যের এই ব্যর্থতার পরেও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ কেন? গত সরকারের আমলে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হইলেও বিগত সরকার মাত্র ১০ লক্ষ টাকা ধার্য করিয়াছিল। এইবার সেই বরাদ্দ ১০৭ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। একই ভাবে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউশন তথা আই এস আই এর জন্য গতবারের ১৬৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বাড়াইয়া এইবাবে করা হইয়াছে ২৩৯ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পে বরাদ্দ গত বারের ১১৫ কোটি হইতে ১৫০ কোটি করা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর উন্নতিকল্পে বিগত বারে ১১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইলেও এইবারে ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বাড়িয়াছে এশিয়াটিক সোসাইটির বরাদ্দও। রাজ্যের দাবি মানিয়া কল্যাণীতে এইমস গড়িবার জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এলাহাবাদ-হলদিয়া নৌপথ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তবুও মমতা বাজেট লইয়া নানা মন্তব্য করিতেছেন। বলিতেছেন ব্যাঙ্কে টাকা রাখিলে ফেরত পাইবার নাকি কোনো গ্যারেন্টি নাই। অথচ তৃণমূলের সৌজন্যে সারদার টাকা লোপাট হইয়াছে, রোজভ্যালির টাকা লোপাট হইতেছে, অ্যালক্যামেস্টির টাকা লোপাট হইবে। তবুও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে তৃণমূল বিরোধিতা করিতেছে ও সংসদে অসভ্যতা করিতেছে।

সুভাষিত

পৃথিব্যাং ত্রীণি রত্নানি জলমন্নং সুভাষিতম্।
মূঢ়ৈ পাষাণখণ্ডেষু রত্নসংজ্ঞা প্রদীয়তে।।

পৃথিবীতে তিন প্রকারের রত্ন আছে—জল, অন্ন ও সুমধুর বাক্য। কিন্তু বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা শুধুমাত্র পাথরের টুকরোকেই রত্ন মনে করে।

সংবাদ প্রতিবেদন

দেশের সিংহভাগ এনজিও-ই দেয়নি আয়-ব্যয়ের হিসাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সিবিআইয়ের একটি সাম্প্রতিকতম সমীক্ষায় ধরা পড়েছে যে অধিকাংশ বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও)-ই এখনও তাদের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসেব দাখিল করেনি। এই এনজিও-গুলি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে নথিভুক্ত। সেই অনুযায়ী তাদের কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাছে বার্ষিক রিটার্ন জমা দেবার কথা। সিবিআই সূত্রে খবর, আগামী তিন মাসের মধ্যে তাদের আধিকারিকরা তদন্ত শেষ করে এ ব্যাপারে সন্দেহজনক এনজিও- গুলির একটি তালিকা পুরোপুরি তৈরি করে ফেলতে পারবেন। একটি জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটি জানিয়েছে, গুজরাট ও তামিলনাড়ু বাদে প্রায় সব রাজ্য থেকেই বার্ষিক রিটার্ন জমা না দেওয়া এনজিও-গুলির তালিকা তারা পেয়ে গিয়েছে। বিচারপতি এইচ এল দাত্তু সিবিআই-এর আবেদনের ভিত্তিতে এ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আরও তিন মাস সময় দিয়েছেন। সংস্থার পক্ষে এ এস জি এল এন রাও আশা প্রকাশ করেছেন গুজরাট ও তামিলনাড়ু থেকেও তাঁরা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন শীঘ্রই। তবে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন তার পরিমাণও নেহাত মন্দ নয়। লক্ষাধিক পাতা ছাড়িয়েছে এই তথ্যপ্রমাণাদি।

পশ্চিমবঙ্গে এনজিও-র সংখ্যা প্রায় ২.৩৪ লক্ষ। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে মাত্র ১৬ হাজার এনজিও-র বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা পড়েছে। সারা দেশে এমন এনজিও-র সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও বেশি। এম এল শর্মার দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সিবিআই-কে এও নির্দেশ দিয়েছিল যে গোটা দেশে সমস্ত নথিভুক্ত এনজিওগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করতে যাতে নিশ্চিত করতে হবে যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তারা ব্যালেন্সশীট জমা দিয়েছে কিনা। এ ব্যাপারে সিবিআই আদালতকে একদিকে যেমন জানিয়েছে গুজরাট ও তামিলনাড়ু থেকে এই তালিকা একেবারেই জোগাড় করা যায়নি, অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্রও থেকেও এ ব্যাপারে যে তালিকা জোগাড় করা গিয়েছে তাও আংশিক।

এক্ষেত্রে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের সুযোগ প্রসারিত করে সর্বোচ্চ আদালত এই মামলাটিকে গ্রহণ করেছিল ২০১১ সালে। যখন দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের বিরাট ব্যক্তিত্ব আন্না হাজারের পরিচালনাধীন হিন্দ স্বরাজ ট্রাস্ট নামক এনজিওর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আনা হয়েছিল। গত সেপ্টেম্বরে একটি পৃথক নির্দেশে আদালত সিবিআই-কে একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে বলেছিল যাতে সমস্ত নথিবদ্ধ এন জি ও-র নাম থাকবে এবং সরকারের কাছে তারা আয়কর জমা দিয়েছে কিনা সেই তথ্যও থাকবে। ইতিপূর্বে সিবিআই এ ধরনের এনজিও সম্পর্কে তথ্য জোগাড়ের কাজটি সমস্যাবহুল বিবেচনা করে এ রাজের দায়ভার রাজ্যের ওপরই চাপাতে চেয়েছিল। কিন্তু আদালত গোয়েন্দা সংস্থার এহেন দাবি নস্যাৎ করে একাজে আরও সময় নিতে সম্মতি জানাল। আসলে দেশের অধিকাংশ এনজিও-ই কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকারের সাহায্য পেয়ে থাকে।

অরুণাচলের রাজ্যপালের সতর্কবার্তা

নিরাপত্তার দৃষ্টিতে ভারত-চীন সীমান্তে জনবসতি গড়া হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীন-ভারত সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেঃ জেনারেল নির্ভয় শর্মা (অবসরপ্রাপ্ত) সম্প্রতি সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন এবং ভারত সরকারের পুনর্বাসন নীতি পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এন ও সি) বরাবর এলাকায় জনসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার পক্ষে গভীর উদ্বেগের বিষয়। গত সপ্তাহে রাজ্যপাল শ্রী শর্মা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরকে এই বিষয়টি জানিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বর্ডার এরিয়া সিকিউরিটি ও ডেভলপমেন্ট অথরিটি গঠন করার জন্য সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর মতে যত শীঘ্র সম্ভব বিষয়টি মোকাবিলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তা না হলে চীনের ভীতি প্রদর্শন ঘটতে থাকবে, ক্রমশই আমাদের জমি চীনের দখলে চলে যেতে থাকবে যা উত্তর মায়ানমার সীমান্ত বরাবর ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি।

রাজ্যপাল শ্রী শর্মা একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার যিনি দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন। তাঁর প্রস্তাব, সীমান্তরেখা বরাবর গ্রামগুলিতে নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রায় ৫০ হাজার নাগরিকের বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সীমান্ত এলাকার উন্নয়নের বিষয়টি একটি বৃহৎ প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রস্তাব— প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর নিযুক্ত আধা-সামরিক বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর লোকেরাও গ্রামবাসীদের সঙ্গে একই পরিকাঠামো, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও সেনা চলাচলের উপযোগী ব্যবস্থার সুবিধা ভাগ করে নেবেন।

সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেই এই প্রকল্পটি সামগ্রিক ভাবে রূপ দিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। কেননা চীন বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে তাদের দিকে সীমান্ত বরাবর ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যেমন, সড়ক-রেল-বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে। আর ভারতের দিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সড়ক পথের দূরত্ব প্রায় ৫০-৬০ কিলোমিটার।

মালদা থেকে পাচার করা শিশুদের কি জঙ্গি ডেরায় পাঠানো হয়েছিল?

সংবাদদাতা : মালদা॥ সম্প্রতি মালদা জেলা থেকে কেরলে পাচার হয়ে যাওয়া ১২৩টি শিশুকে ইংরেজি শিক্ষার নাম করে পাচার করার খবর সব পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই সব মুসলমান শিশুকে কি জঙ্গি ডেরায় পাঠানো হয়েছিল? মালদাতে সি আই ডি-র ৬ সদস্যের যে দলটি তদন্ত করতে কেরল থেকে এসেছিলেন তাঁরা মুখে কিছু না বললেও মালদা জেলার যেসব স্থান থেকে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই সব জায়গাতে ওই সব শিশুর অভিভাবকরা না জেনে-শুনে তাদের ছেড়ে দেননি। ধর্মীয় কাজে তাদের একটি ছেলেকে দিয়ে নিজেদের পুণ্যবান বলেই মনে করেছিলেন তাঁরা। মালদা জেলার রতুয়া-১, রতুয়া-২, চাঁচল-১, হরিশচন্দ্রপুর-২ এবং মানিকচক থেকে ১২৩ জন শিশুকে যারা নিয়ে গিয়েছিল সেই চারজন— মহম্মদ আফজল হোসেন, হাজি জাহিরতদ্দিন, আবুবকর এবং মাসুর রহমান, কেবল অর্থের বিনিময়ে তাদের নিয়ে যায়নি। জেহাদি কার্যকলাপ চালানোর জন্য এবং ধর্মীয় দিক থেকে তৈরি করতেই এরা কেরলের মল্লিকাপুরম জেলার ভেকটাথুরে আনারুল হোদা কমপ্লেক্স নামে একটি সংস্থায় নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। সি আই ডি তদন্ত করলেই এই শিশুদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা প্রকাশ পাবে। তবে এই ঘটনা নিয়ে কেরল হাইকোর্টের নির্দেশে পূর্ণাঙ্গ তদন্তে নেমেছে ওই রাজ্যের সি আই ডি। কারণ শিশু পাচারের পাশাপাশি অভিযোগ ওঠে, অনাথ আশ্রমের আড়ালে (আনারুল হোদা কমপ্লেক্স) কিশোরদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ দেওয়া হোত। এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতেই গত ২৪ জুন কেরল থেকে সি আই ডি-র টিম মালদাতে আসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালদা জেলা থেকে ইতিপূর্বে আরো অনেক শিশুকে ইংরেজি শিক্ষার নাম করে বাবা-মা-র সম্মতিতে কেরলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের কোথায় পাচার করা হয়েছে বা প্রশিক্ষণ দিয়ে জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিনা তদন্ত করলেই তা জানা যাবে। তবে এইসব এলাকাতে প্রতি বাবা-মা-র ৬-৭টি শিশু প্রায় প্রতি পরিবারে থাকায় তাদের মধ্যে থেকে একটি বা দুটি ছেলেকে ধর্মীয় কাজে দিয়ে দেওয়ার প্রথা রয়েছে। যারা এদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। প্রশাসন মুখ না খুললেও এই ঘটনা ভয়ঙ্কর।

ধুতি পরার জন্য বিচারপতিকে ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হলো না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরও শুধু ধুতি পরার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোশিয়েশন ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হলো না। এই ঘটনা ঘটেছে গত ১২ জুলাই। ওই ক্লাবে এই পোশাকের বিধি বা 'ড্রেস কোড' সেই বৃটিশ শাসকরা চালু করেছিলেন। কিন্তু সেই বৃটিশ-দাসত্বের মানসিকতা থেকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এখনও বেরিয়ে আসতে পারেননি।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি ডি হরিপ্রাণথামন (D. Hariparanthaman) একটি বইয়ের আবরণ উন্মোচনের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি টি এস অরুণাচল এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। ক্লাবে প্রবেশ করতে গেলে তাঁর স্টাফেরা বিচারপতি হরিপ্রাণথামন-কে ধুতি পড়ে ঢুকতে বাধা দেয়। স্টাফেরা জানায়, ক্লাব-কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আছে যে পোশাকবিধি না মানলে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। পোশাক-বিধির প্রতিবাদ জানিয়ে বিচারপতি হরিপ্রাণথামন বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার এত বছর পরও বৃটিশ শাসকদের তৈরি করা পোশাক-বিধি ক্লাব কর্তৃপক্ষ চালু রেখেছেন এবং আমাদের পরাম্পরাগত পোশাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটাই প্রথম ঘটনা নয়। ১৯৮০ সালে এখানকার জিমখানা ক্লাবে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার-কে একই কারণে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তিনিও ক্লাবের 'গেস্টবুক'-এ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একই কারণে মাদ্রাজ হাইকোর্টের আইনজীবী আর গান্ধী এবং জি আর স্বামীনাথনকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

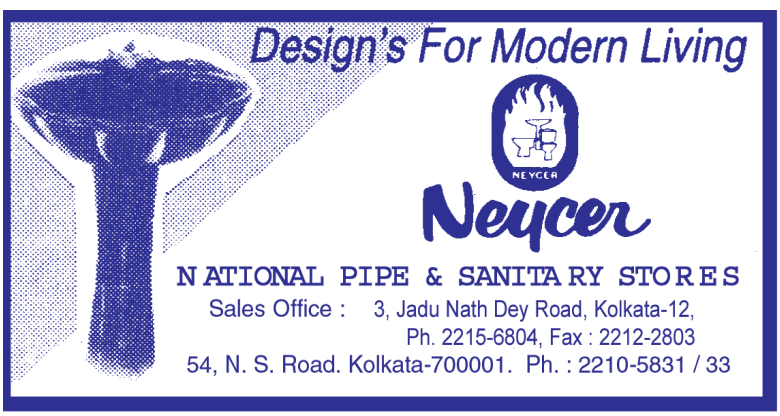

শরিয়ত আদালতের আইনি বৈধতা নেই, মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুসলমান সমাজের ধর্মীয় নেতাদের জারি করা ফতোয়া কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনওই মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে পারে না। গত ৭ জুলাই-এর রায়ে এমনই মন্তব্য করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রথমবার এই রায় দিতে গিয়ে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে যাই আদেশ দিক না কেন শরিয়ত আদালত তার নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দিতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, মুসলমান সমাজের যাঁরা এই আদালতের দ্বারস্থ হবেন শুধু তাঁরাই শরিয়ত আদালতের বিচার্য হতে পারেন, দেশে এমন নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। রায় দিতে গিয়ে সর্বোচ্চ আদালত বলেছে : 'দার-উল-কোয়াজাস বা এই বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো ফতোয়া বা নির্দেশ জারি করতে পারবে না যা মানবাধিকার মর্যাদায় আঘাত দেয় কিংবা কোনও ব্যক্তির কাছে আপত্তিজনক মনে হয়।' বিশ্বলোচন মদনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা এই রায় দেন। মদন তাঁর দাখিল করা পিআইএলে বলেন, শরিয়ত আদালতের রায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমান সমাজের মহিলাদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। বিচারপতি সি কে প্রসাদ ও পি সি ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ একথাও বলেন যে শরিয়ত আদালতের কোনো আইনি স্বীকৃতি নেই। সুতরাং মুসলমান ধর্মগুরুদের ফতোয়াকে শুধুমাত্র তাদের মতামত বলেই ধরে নিতে হবে, 'আদেশ' বলে নয়। এবং এ ধরনের আদেশ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে তার মধ্যে আটকানো যাবে না, এমনকী তিনি স্বয়ং যদি শরিয়ত আদালতের কাছে বিচারের জন্য দ্বারস্থ হন তাহলেও।

মামলাকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এমনও মনে করেছে যে ফতোয়াকে ধর্মীয় আদেশ বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা আসলে 'মুসলমানদের ধর্মভীতি'র কারণে ঘটে এবং এটি 'মানসিক প্রভাব' ব্যতীত আর কিছু নয়। আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এ প্রসঙ্গে আরও বলেছে যে মোঘল কিংবা বৃটিশ আমলে একটি ফতোয়া-র যে গুরুত্ব ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানে তার কোনো স্থান নেই। মুসলমান যুবতী ইমরানার ঘটনাটা আদালতের 'চোখ খুলে দিয়েছে' বলেও তাঁরা মন্তব্য করেন। যেটা নির্দোষ ব্যক্তিদের ওপর ফতোয়া জারি করা হচ্ছে বলে তাঁদের বুঝতে সাহায্য করেছে। আদালত বিশেষভাবে নির্দেশ করেছে যে ইমরানার তার শ্বশুরের দ্বারা যৌন নিগৃহীত হবার ঘটনাটিকে। আদালত বলেছে তাদের হতভম্ব করে মুসলমান আদালত ফতোয়া জারি করে তার স্বামীর থেকে ইমরানা-কে পৃথক হবার নির্দেশ দিল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার এই ফতোয়া দিতে গিয়ে ইমরানা বা তার স্বামীর কোনো মতামতই নেওয়া হয়নি বলে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করেছে। এর ফলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকেও লঘু করে দেওয়া হয়েছে বলে বিচারপতিদ্বয় নির্দেশ করেছেন। বেঞ্চ এও বলেছে যে এধরনের নির্দেশ আসলে মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই সামিল।

আদালতের মূল বক্তব্য এই যে 'ফতোয়া'কে 'নির্দেশ' বলে মানলে চলবে না। একে বরং 'পরামর্শ' বলে মানা যেতে পারে। যেটা মানা, না মানা নির্ভর করছে বাদী-বিবাদী পক্ষের ওপর। প্রসঙ্গত, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এবং দার-উল-আলম এ ধরনের ফতোয়া জারি করে থাকে এবং যা সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হয়। এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ে মুসলমান ধর্মযাজকদের মনোভাব কতটা পরিবর্তিত হয় বা আদৌ হয় কিনা সেটাই এখন দেখার। ■

গিরিরাজ কিশোরের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রবীণ কার্যকর্তা গিরিরাজ কিশোর গত ১৩ জুলাই ৯৬ বছর বয়সে দিল্লীর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রবক্তা প্রকাশ শর্মা জানান, ''গিরিরাজ কিশোর প্রথম জীবনে স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদে যোগদান করে রামমন্দির আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।''

স্বাস্থ্যের কারণে তিনি গত কয়েক বছর অসুস্থ ছিলেন। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি সমর্থন করেন ও হিন্দু সমাজের কাছেও আবেদন রাখেন।

রামপ্রকাশ ধীর প্রয়াত

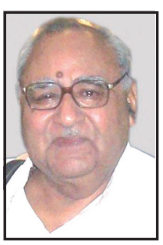

গত ২০ জুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক রামপ্রকাশ ধীর ইয়াংগনের একটি হাসপাতালে ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। প্রয়াত ধীর মায়নমারে সঙ্ঘের বিশ্ববিভাগের দায়িত্বে ছিলেন।

‘এক প্রতিবাদীর মৃত্যু ও নোংরা রাজনীতি’

গোপাল চক্রবর্তী॥ অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এলাকার সমাজ বিরোধীদের চক্ষুশূল হয়েছিল বামনকাছি কুলবেড়িয়ার প্রতিবাদী কলেজছাত্র সৌরভ চৌধুরী। তারই ফলশ্রুতিতে গত ৫ জুলাই তৃণমূলাশ্রিত দুষ্কৃতী শ্যামল কর্মকারদের হাতে নৃশংস ভাবে খুন হতে হয়েছিল তাঁকে। এক সময়ে সিপিএম এবং বর্তমানে তৃণমূলের আশ্রিত স্থানীয় কয়েকজন নেতার অপকর্মের দক্ষিণ হস্ত শ্যামল কর্মকার। সৌরভ হত্যার পর বেলেঘাটার আর এক তৃণমূলের নেতা শিশির মুখোপাধ্যায়ের ছত্রছায়ায় তারাপীঠ হয়ে রামপুর হাট অবধি পৌঁছে গিয়েছিল শ্যামল। উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ রাজ্যে পালানো, কিন্তু সেখানেই সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। সৌরভ খুনে স্থানীয় তৃণমূল জড়িত এই খবর প্রচার হতেই তৃণমূল নেতারা বিজেপি-র ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সগর্বে ঘোষণা করেন সৌরভ বিরাটি কলেজের তৃণমূল ছাত্রপরিষদের কর্মী। তৃণমূল ছাত্রপরিষদের রাজ্য সভাপতি শঙ্কুদেব পাণ্ডা এককাঠি এগিয়ে বিরাটি কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বসলেন এফ আই আর করার চাপ দিতে। পেশায় সরকারি কর্মচারী সৌরভ চৌধুরীর বাবা সরোজ চৌধুরী বিজেপি-র আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি, মা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি প্রার্থী ছিলেন। সৌরভের দাদা সন্দীপ চৌধুরীর কথায় সৌরভ কোনোদিনও টি এম সি পি-র সমর্থক ছিল না। বাবা যেহেতু বিজেপি-র স্থানীয় নেতা তাই দু-ভাই কখনও বিজেপি-র মিটিং-এ গেছে, বিজেপি-র হয়ে কাজ করেছে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর এ রাজ্যেও বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার হিড়িক পড়েছে, কিন্তু সরোজবাবুরা বহু দিনের বিজেপি কর্মী। সৌরভের খুনের সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তথাগত রায়, পিসি সরকার, শমীক ভট্টাচার্য-সহ বিজেপি-র রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব সৌরভ পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন, পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সৌরভের হত্যার সাতদিনের মাথায় বামনগাছিতে মঞ্চ বেঁধে সভা করে তৃণমূল। উপস্থিত নেতানেত্রীরা একটা ছবি দেখিয়ে সৌরভ যে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী তা প্রমাণ করার জন্য সোচ্চার হন। তৃণমূলনেতা মুকুল রায় একা সৌরভের বাড়িতে গিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এমনকী এই নেতার সামনে বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেন স্থানীয় মহিলারা। অবশেষে সৌরভের দাদা সৌজন্য দেখিয়ে দরজা খুলে তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেন। তিনি অবশ্য পরিবার যাতে ন্যায়বিচার পায় সেই আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনা হলো, মুকুলবাবু এর দু'দিন পরই বসিরহাটে সৌরভকে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের কর্মী বলে দাবি করেন। ফলে সৌরভের পরিবার ও স্থানীয় মানুষ চরম হতাশ। স্থানীয় ভাবে এখন দাবি উঠেছে, সৌরভ খুনের পর শ্যামলদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে যদি শ্যামলের দিদি পলি মাইতিকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, তবে একই অপরাধে অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের কেন গ্রেপ্তার করা হবে না? তৃণমূলের আক্রমণে আক্রান্ত সারা পশ্চিমবঙ্গের সব পরিবার এখন সরোজ চৌধুরীর পাশে। সুটিয়ার প্রতিবাদী মঞ্চ, কামদুনির সমব্যথীরা, বালির নিহত তৃণমূলনেতা তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত, কার্টুন-মামলায় নিগ্রহের শিকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্ররা সৌরভের ২১তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। এরপর কী হয় তার উত্তর সময় দেবে।

সৌরভ চৌধুরী

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রীকে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের স্মারকলিপি

গত ২৮ জুন কলকাতায় ভারতের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানী এসেছিলেন। সে সময় ভারতীয় জনতাপার্টির কার্যালয়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে তাঁদের স্মারকলিপি জমা দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অধ্যাপক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ড. ভাস্কর পুরোকায়স্থ, অধ্যাপক নির্মল মাইতি, ড. বিনায়ক সমাদ্দার চৌধুরী, অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী এবং অজিত বিশ্বাস।

ওই স্মারকপত্রে দাবি জানানো হয়েছে— কলকাতা শহরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হোক সেখানে একটি বড় হল, একটি **Holocust Memorial** থাকবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব— ড. শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মুখার্জি পরিবারের আদি বাসস্থান হুগলী জেলায় জিরাটে ছিল, সেখানে গড়ে উঠুক এই বিশ্ববিদ্যালয়। তৃতীয় প্রস্তাব--- শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-রহস্যের তদন্ত হোক। চতুর্থ প্রস্তাব— আমাদের ইতিহাস বই-এ শ্যামাপ্রসাদ অনুল্লেখিত রয়েছে। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা শ্যামাপ্রসাদকে ইতিহাস বই থেকে বাতিল করে দিয়েছে। তাই কেউই শ্যামাপ্রসাদকে জানে না চেনে না। তাই আমাদের প্রস্তাব প্রথম স্কুল ছাত্রদের জন্য সচিত্র শ্যামাপ্রসাদ জীবনী প্রকাশ করে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা। ভারতের সব ভাষায় তা প্রকাশ করা।

বেছে বেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে

গূঢ়পুরুষের

কলম

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য। বেপরোয়া খুন ও নারী ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা। নেত্রী সবকিছুই ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, ও' সবই মিডিয়ার অপপ্রচার। নেত্রী ভুলে গেছেন, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই ইত্যাদির ঘটনা বাম জমানায় হয়েছিল। তখন সিপিএমের হার্মাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মিডিয়াই সবচেয়ে বেশি সরব হয়। মিডিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ডাক দেয়। সেই সময় পরিবর্তনের যে ঝড় উঠেছিল তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার থেকে মিডিয়ার কৃতিত্ব কোনও অংশে কম ছিল না। মিডিয়ার সৌজন্যেই সিপিএম বিরোধী আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদল মমতা এবং তাঁর অনুগত চেলা-চামুণ্ডারা করেছিলেন তা সত্য নয়। যেমন, মিডিয়ার কাজ নয় শাসকদলের পায়ে তেল মর্দন করা। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে মিডিয়া জনস্বার্থবিরোধী সরকারি নীতি ও শাসকদলের হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা নেবে। এটাই কাম্য। মমতা প্রায়ই বলেন, তাঁর সরকার তিন বছরে অনেক ভাল ভাল কাজ করেছে। মিডিয়া সেইসব ভাল ভাল কাজ প্রচার করে না। কী সেইসব ভাল ভাল কাজ রাজ্যের ৫ শতাংশ মানুষই জানেন না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে তৃণমূল সরকার জনকল্যাণে ভাল ভাল কাজ করেছে, সেক্ষেত্রে নেত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে ভাল ভাল কাজ করার জন্যই বাংলার মানুষ তাঁর সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্য গড়তে নয়। মিডিয়া জনমানসের দর্পণ। মানুষ জানতে চায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় কেন খুন ধর্ষণে অভিযুক্তদের বুক ফুলিয়ে ঘুরতে দেখা যায়। সাংসদ তাপস পাল অথবা অনুব্রতরা দুষ্কৃতীদের ভাষায় কথা বলেও কেন নেত্রীর আশীর্বাদধন্য হয়। একটা কথা স্পষ্ট যে নেত্রীর কাছে বাংলার মানুষের স্বার্থের থেকে তাঁর দলদাসদের স্বার্থ রক্ষা অনেক বড়। তা' না হলে টালিগঞ্জের অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা চলাকালেই মমতা তাঁকে রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংসদের সভাপতির পদে বসিয়ে দিয়েছেন। এতবড় একটা নজিরবিহীন ভাল কাজের পরেও মিডিয়া ধন্য ধন্য বলে স্তাবকতা করছে না বলে নেত্রী গোঁসা করছেন।

সব থেকে আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে কলেজে ছাত্রভর্তির সময় তৃণমূলীদের ব্যাপক তোলা আদায় করা। এই তোলা আদায় এবং হয়রানি বন্ধের জন্যই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ইন্টারনেটে অন লাইন ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। অন লাইনে ফর্ম ডাউনলোড করে ছাত্রভর্তির ব্যবস্থা করা হলে তৃণমূলীদের পকেটে টাকাটা আসবে কীভাবে। কথাটা কানে যেতেই ব্রাত্য বসুকে বরখাস্ত করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নেত্রী শিক্ষামন্ত্রী করেদিলেন। পার্থবাবু শিক্ষামন্ত্রী হয়েই পরেরদিনই অন লাইন ভর্তির ব্যবস্থা বাতিল করেদিলেন। অর্থাৎ কমপক্ষে ২ লক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে তোলা আদায়ের পাকা বন্দোবস্ত। গরিব বাড়ির ছেলে তোলা দিতে না পারলে কি হয় তার টাটকা উদাহরণ নদীয়া জেলার শান্তিপুরের কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে নেপাল রাজবংশী বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা। একটু পিছনে তাকান তবে মনে পড়বে গত বছরের ৫ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষকে তাঁর অফিস ঘর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে তৃণমূলীরা ব্যাপক মারধর করে। এই ঘটনার সাতদিনের মধ্যেই ১১ জানুয়ারি রামপুরহাট কলেজের অধ্যক্ষকে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতেই পেটায় তৃণমূল ছাত্র-পরিষদের দুষ্কৃতীরা। গত তিন বছরে তৃণমূল রাজত্বে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গে দুষ্কৃতীরাজের অবসান ঘটাতে পারে আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ। গত লোকসভা ভোটে মাত্র ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তৃণমূল প্রার্থীরা ৩৪টি আসন পেয়েছে। এর কারণ, ভোট বিভাজন। আগামী ২০১৬ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হবে। কংগ্রেস এবং বামদল বিশেষত সিপিএমের অস্তিত্ব নেই এই রাজ্যে। লড়াই হবে সরাসরি বিজেপি-র সঙ্গে তৃণমূলের। সেভাবে কংগ্রেস ও বামেরা ভোট বিভাজন করে তৃণমূলকে জেতাতে পারবে না। বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মুখপাত্র সিদ্ধার্থনাথ সিং আবেদন জানিয়েছেন, '২০১৬ সালে আপনার লক্ষ্য হোক পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল মুক্ত রাজ্য করা।' লোকসভার ভোটে রাজ্যে বিরোধী দল হিসাবে বিজেপি-র উত্থান চমক সৃষ্টি করেছে। মনে রাখতে হবে যে ৩৪টি লোকসভার আসন জিতেও তৃণমূল নেত্রী মোটেই স্বস্তিতে নেই। তিনি দুষ্কৃতীদের দলীয় হাতিয়ার করে বিজেপি-কে শিক্ষা দিতে চাইছেন। বেছে বেছে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। সন্দেশখালিতে বিজেপি-র ১৩ জন কর্মীকে গুলি করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির বারাতলা গ্রামে স্থানীয় বিজেপি নেতা নারায়ণ পাত্রের বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা। উত্তর ২৪-পরগণার বামনগাছিতে কলেজ ছাত্র সৌরভ চৌধুরীকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সৌরভের পরিবার বিজেপি-র দীর্ঘকালের কর্মী। এইসব প্রাণঘাতী হামলার কারণ এই রাজ্যে বিজেপি তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে উঠে আসছে। তাই বলছি, ২০১৬ সালে বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতা দখল করতে পারে। কারণ, সময় পাল্টাচ্ছে। নবীন প্রজন্ম পরিবর্তন চায়। উন্নয়ন চায়। কাজ চায়। কলেজে ভর্তি হতে গেলে দশ পনেরো হাজার টাকা তোলা দেওয়াটা তাঁরা মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। ভোটযন্ত্রের বোতাম টিপে নেপাল রাজবংশীর মতো ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ করবেনই। নেত্রী দয়া করে মনে রাখুন, দীর্ঘকাল পাপের রাজত্ব চলে না। চলতে পারে না। ■

নাটকের কল্যান হোক

মাননীয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাংসদ, তৃণমূল কংগ্রেস

একেই বলে নাটক! সত্যজিৎ রায়ের লেখা বইয়ের নামকেই একটু এদিক ওদিক করে প্রথম লাইনটা মনে পড়েছিল সেদিন। দাদা গুণীজনের সঙ্গে থাকলে যে একটু একটু গুণ আয়ত্ত করা যায় আপনি তার বড় উদাহরণ। মাথা গরম করে টিভি স্টুডিও-য় আস্ফালন কিংবা সাদা বাংলায় লাফালাফি করা আমরা দেখেছি তবে সেদিন লোকসভা থেকে বেরিয়ে যেভাবে নাটকটা করলেন তার সত্যিই জবাব নেই। আপনি তো দেশখ্যাত আইনজীবী। হাইকোর্ট - সুপ্রিমকোর্টে অনেক সওয়াল করেন। সেখানেও কি এমনটা করতে হয় নাকি!

আমার মনে হয়, এটা আপনার মধ্যে নতুন এসেছে। আসলে চারপাশে মুনমুন, শতাব্দী, তাপস, দেব থাকলে সবারই এমন অভিনয় প্রতিভা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। একবার সেদিনের গল্পটা বলি। গোটা দেশের মিডিয়াকে তাক লাগিয়ে দিলেন। এবার সিনে অ্যাওয়ার্ডও মিলে যেতে পারে। বিজেপি'র বিরুদ্ধে লোকসভায় দলের মহিলা সাংসদদের ওপর অভব্য আচরণের অভিযোগ তুলল আপনার দল তৃণমূল কংগ্রেস। আর তার জেরে রেল বাজেটের থেকেও বড় ইস্যু হয়ে গেল বাজেট পরবর্তী নাটক। কেন নাটক বলছি বারবার তা আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। যারা দেখেছেন তারা সবাই বুঝেছেন। আপনি অভিযোগ জানান, মহিলা সাংসদদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি শ্লীলতাহানিরও চেষ্টা হয়। কিন্তু ক্যামেরায় ভরা লোকসভায় এমন এক কুচি ছবিও ধরা পড়ল না। যাঁরা আক্রান্ত বলে অভিযোগ আনলেন, তাঁরা আবার অভিযুক্ত সাংসদকে চিহ্নিত করতেও পারলেন না। একজন বললেন তিনি মদ্যপ ছিলেন। আর একজন বললেন, মদ্যপ থাকলেও থাকতে পারেন। আর বাংলায় বসে আপনার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন, একজন মহিলা সাংসদের শাড়িও নাকি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হায়! দল যে অভিযোগ স্পিকারের কাছে জমা দিল তাতে সেইসবের উল্লেখ নেই। ফলে গোটা ঘটনাটাতেই কেমন একটা সাজানো নাটুকে গন্ধ স্পষ্ট।

ঠিক কী হয়েছিল? সংসদে উপস্থিতদের বয়ান এই রকম : সদানন্দ গৌড়া রেল বাজেট পেশ করে লোকসভা ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনও শেষ। সংসদ তখন চলছে। হঠাৎই বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ তুলে লোকসভায় বিক্ষোভ চালাতে শুরু করেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরা। ভিড় করে ওয়েলে নেমে সংসদ অচল করে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। কয়েকজন বিজেপি সাংসদও পাল্টা স্লোগান দিয়ে থামাতে চান তাঁদের।

কাট টু সংসদের গেট। আচমকাই দেখা যায় আপনি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটে বেরিয়ে আসছেন। পিছন পিছন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো আবার খালি পায়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকে ছুটে আসছেন সংসদ চত্বরে। পিছনে সুব্রত বক্সি-সহ অন্যান্য সাংসদরা। গান্ধী মূর্তির কাছে চলে এলেন। ঠিক যেখানে যাবতীয় টিভি চ্যানেলের ক্যামেরা থাকে। এইবার নাটকের ক্লাইমেক্স। আপনি কল্যাণবাবু কাঁদছেন, ফোঁফাচ্ছেন বোঝা যাচ্ছে না। অতি নাটক দেখে আপনাকে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট আপনার দলেরই অন্যান্য সাংসদরা। শেষে তো আপনাকে কোনওরকমে সাইড করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করলেন বক্তব্য। তখন কিন্তু সিনেই নেই দলের প্রবীণ সাংসদরা কেউ। আপনি যখন শ্লীলতাহানির মতো মারাত্মক অভিযোগ করছেন তখন পাশে দাঁড়িয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের অভিযোগে তেমন কোনো ঝাঁঝ নেই। ঝাঁঝ নেই শতাব্দী রায়ের গলাতেও। ততক্ষণে আবার হুগলীর চণ্ডীতলায় সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করে দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি আবার বললেন, মেয়েদের শাড়ি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। কী কী গালাগাল দেওয়া হয়েছে তারও তালিকা দিলেন। কিন্তু মিলল না। লোকসভায় সৌগত রায় যে তালিকা দিলেন তার সঙ্গে মিলল না গালাগালের উদাহরণ। ওদিকে সংসদের ফুটেজে আপত্তিকর কিছুই নেই।

সব মিলিয়ে তেমন জমল না নাটক। হাততালিও পড়ল না। বরং হাসির রোল উঠল বেশ। কারণ, ততক্ষণে গোটা দেশ বুঝে গেছে তাপস পালের (পড়ুন মালের) কুকাণ্ড ঢাকতেই এত নাটকীয় আয়োজন। ওই দিনই তাপস পাল পিঠের ব্যথার জন্য কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। কুজনে বলছে, সংসদে মুখ দেখাতে পারবেন না বলেই এই সিদ্ধান্ত। তবু বিভিন্ন দলের দাবি মেনে নিন্দা করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন। কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে যে দুর্গন্ধ তিনি ছড়িয়েছেন তাতে গোটা বাংলাই নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছে। সূত্রের খবর, এসব দেখেই তৃণমূল কংগ্রেস পালটা নাটকের মহড়া দেয়। শুধু আমরা নয়, সবাই খারাপ প্রমাণ করার জন্য রীতিমতো চিত্রনাট্য রচনা করেই নাটক। কিন্তু সংলাপ মুখস্থ না হওয়ায় একেক জনের মুখে একেক কথা শোনা গেল। নাটক ভেস্তে গেল। এমন কুনাট্য অনেকদিন দেখা হয়নি। আপনাদের কল্যাণ হোক কল্যাণবাবু!

— **সুন্দর মৌলিক**

মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা

কে. এন. মণ্ডল

ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি ভারতবর্ষের মতো অন্য কোথাও এমন চর্চিত নয়। এর কারণ নিহিত রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং হানাহানি সর্বত্রগামী ছিল না এবং ধর্মপালনের জন্য সাংবিধানিক রক্ষা কবচের দরকার ছিল না। সকলেরই জানা আছে যে সনাতন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম কিংবা জৈনধর্মে হিংসার স্থান নেই।

মধ্যযুগে মহম্মদ-বিন-কাসেম, আহম্মদ-শা-আবদালি, মহম্মদ গজনীর বারংবার ভারত আক্রমণ, ধ্বংস ও লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, নরহত্যা এবং ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করা, ভারতবর্ষের এক কলঙ্কিত অধ্যায় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুর 'মিলিব এবং মিলাবে' এই ভাবধারার পরিপন্থী। পরবর্তী মুসলমান শাসনের সময় ভারতের উদার মানবতাবাদী ধর্মের উপর ক্রমাগত আগ্রাসন নেমে আসে এবং ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ চলতে থাকে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে বৃটিশ শাসকদের মদতে মুসলিম লীগ ধর্মীয় সংঘাতের পথ বেছে নেয় পাকিস্তান আদায়ের জন্য। যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগের শত উস্কানি সত্ত্বেও ধর্মীয় বিভাজন এড়িয়ে চলতে থাকে। কিন্তু মুসলিম লীগ তাঁদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে চলে এবং ব্যাপক হানাহানিতে লিপ্ত হয়। মহম্মদ আলি জিন্নার সহযোগীরা মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসস্থল 'পাকিস্তানে' হিন্দু-শিখ ও বৌদ্ধ শূন্য করার কাজে লেগে পড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এতদ্ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ তার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে মাথায় রেখে দেশের মূলনীতিতে স্থান দিল 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে'। এখান থেকেই শুরু 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রাজনৈতিক অপব্যবহার, যা বর্তমানে পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক প্রভাবিত করার কাজে এবং রাজনীতির ময়দানে হাজির হয়েছেন বিভিন্ন 'মেকি-ধর্মনিরপেক্ষ' অভিনেতা।

> "সুপ্রিমকোর্টের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত SIT (Special Investigation Team) তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরে সুপ্রিম কোর্টে যে রিপোর্ট দেন, তার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ আদালত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে 'নির্দোষ' ঘোষণা করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এরপরেও কেন্দ্রের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস সরকার আমেরিকার ওবামা প্রশাসনের কাছে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে ভিসা প্রদানের আপত্তির জন্য। এর ফলে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের কাঠামোকেই হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।"

অপরপক্ষে, পাকিস্তান, সাড়ম্বরে তার সৃষ্টির ইতিহাস মাথায় রেখে এবং কোনো রকম কপটতা ছাড়াই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ঘোষণা করল 'Islamic Republic of Pakistan' এবং সঙ্গত কারণেই অমুসলমানদের বিতাড়নের বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু করল একটুও সময় নষ্ট না করে, আর প্রক্রিয়াটি যে অহিংস ছিল না তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বিতাড়নের কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল দ্রুতগতিতে, আর পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা প্রাথমিক বেগ কাটিয়ে মন্থর হয়ে যায়। যার একটি প্রধান কারণ, ১৯৫০ সালের লিয়াকত-নেহরু চুক্তি। এই চুক্তি উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগে নিরুৎসাহিত করে এবং তাঁরা যাতে নিরাপদে স্ব-স্ব দেশে থাকতে পারেন তার নিশ্চয়তা (Guarantee) প্রদান করে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিভাত হয় যে, পাকিস্তানের কাছে Liaquat Nehru Pact একটি ছেড়া কাগজ ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়ত অত্যাচারিত হয়ে হিন্দু বৌদ্ধ সংখ্যালঘুদের ভারতে আগমন চোরা-স্রোতের ন্যায় বহমান থাকে। আবার যখনই কোনো দাঙ্গা হয়, তখনই তা বাঁধভাঙ্গা রূপে পরিগ্রহ করে। মুসলমানদের কৃষ্টি-আচার, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান, পৌত্তলিক হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তাই সহাবস্থান সম্ভব নয়, জিন্নার এই দর্শন এবং তার ফলশ্রুতি ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগ, তথা পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিতাড়ন, সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ।

অন্যদিকে, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র মহান ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে অবিচলিত থেকেই ক্ষান্ত হলো না, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'লোক-বিনিময়ে'র বাস্তব তত্ত্বও বিবেচিত হলো না কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারা। ভারতে জন্মেছেন এবং দেশত্যাগে ইচ্ছুক নন এমন কোনো মুসলমান ভাইকে পাকিস্তানে ঠেলে পাঠানো সম্ভব নয়, নৈতিক

দিক থেকে ভারতের এই অবস্থান অবশ্যই প্রশংসনীয়। বাস্তবে, পাকিস্তান প্রাপ্তির জন্য দাঙ্গাকারী মুসলিম লীগ পন্থীদের অনেকেই ভারতে থেকে গেলেন বুকে বেদনা নিয়ে। তাঁদের কেউ কেউ যদি স্বপ্ন দেখেন বর্তমান ভারতের 'কোনো অংশকে' আর একটি পাকিস্তানে পরিণত করার, তাহলে কি খুবই অবাক হওয়ার কিছু আছে? কোনো কোনো মহল থেকে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ-কারীদের সঙ্গে রাজস্থান- উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে আসা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারীদের তুলনা, কোনো বৃহত্তর পটভূমি নয়তো? বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী এবং ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে পশ্চিমবাংলায় বসবাসকারীদের একই বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করার অপচেষ্টা, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূলে অন্তর্ঘাতের সামিল এবং দেশ-বিরোধী কাজ।

স্মরণ রাখতে হবে, ভারত ছাড়া পৃথিবীর কোনো দেশেই সংবিধানের মুখবন্ধে 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ভারতের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে শেখ মুজিবুর রহমান 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রেখেছিলেন এবং তাঁর নৃশংস হত্যার পরে (১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল) বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। শেখ হাসিনা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধান (শেখ মুজিবুরের সময় ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান) পুনরুদ্ধার করার প্রয়াস করেন, তবে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি পুনর্বাসনে ব্যর্থ হন, দলীয় একাংশের অসহযোগিতা এবং বেগম জিয়ার তীব্র বিরোধিতায়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা কিছু কিছু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ছাড়া, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের কোনো স্থান নেই এবং তাঁদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো 'সাইনবোর্ড' দরকার হয় না। আমাদের মতো দেশে এই কারণে সাইনবোর্ড দরকার কারণ আমরা অনেকেই মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করি (Pseudo-secularism)। তাই স্বাধীনতা লাভের ৬৭ বৎসর পরেও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী বামপন্থীদেরও ভোটে প্রার্থী নির্বাচনের সময় হিন্দু প্রার্থীকে হিন্দু গরিষ্ঠ এবং মুসলমান প্রার্থীদের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচন করতে হয়, ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য। এক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা কোনো মাপকাঠি নয়। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই বলতে পারে 'ভোটে সফলতাই' তাঁদের প্রার্থী নির্বাচনের মাপকাঠি, ধর্ম নয়। তাই গুজরাটের বিধানসভায় একজন মুসলমান প্রার্থী না থাকলেও তাঁদের হাত কচলাতে হয় না। কেননা তারা মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী নয়।

সেদিক থেকে বিচার করলে, ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক ঘোষণা অনেক বেশি স্বচ্ছ। সংখ্যালঘু-সহ ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য Common Civil Code বা সর্বজনীন দেওয়ানি আইন প্রবর্তনের চেষ্টা ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার না করা বা তোষণের বিরুদ্ধাচারণ করে সকল মানুষের জন্য বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের চেষ্টা ও সংখ্যালঘুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসের প্রতিশ্রুতি, কোনোভাবেই বিভাজনের রাজনীতি হতে পারে না। বরং সুপ্রিম কোর্টের বারবার পরামর্শ সত্ত্বেও যাঁরা সংবিধানের মূল নীতি Directive Principle of State Policy-এর মূল সুর Common Civil Code প্রবর্তন করতে অনীহা প্রকাশ করছেন তাঁরাই মেকি-ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চায় রত।

ভারতের রাজনীতি ও সমাজ জীবনে বিভেদের চর্চা তাঁরাই করছেন, যাঁরা গুজরাট দাঙ্গার ১২ বৎসর পরেও (গোধরা কাণ্ডকে অনুচ্চারিত রেখে) গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে দাঙ্গার মুখ হিসেবে কাঠগড়ায় তুলছেন মুসলমান ভোট একাকাট্টা করার জন্য এবং ভোট বাক্সে ফসল তুলতে। অথচ, দুর্ভাগ্যজনক এই দাঙ্গায়, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ফাঁসানোর জন্য কোনো কোনো সমাজসেবী সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন এবং কংগ্রেস সরকার সিবিআই-এর মাধ্যমে গত ১২ বৎসর ধরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়েছে এবং বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস করেছে। অথচ, সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত SIT (Special Investigation Team) তাঁদের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পরে সুপ্রিম কোর্টে যে রিপোর্ট দেন, তার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ আদালত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে 'নির্দোষ' ঘোষণা করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এরপরেও কেন্দ্রের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস সরকার আমেরিকার ওবামা প্রশাসনের কাছে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীকে ভিসা প্রদানের আপত্তির জন্য। এর ফলে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের কাঠামোকেই হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। নরেন্দ্র ভাই মোদী ২০১৪ সালের লোকসভার নির্বাচনে দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে কংগ্রেসের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির জবাব দিয়েছে, আর ভুল প্রমাণিত করেছেন রাজনৈতিক পণ্ডিতদের পর্যবেক্ষণ, 'বহু দলীয় সরকারই ভারতের ভবিতব্য'। এরপরেও যাঁরা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গুজরাটের দাঙ্গার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদীকে কটাক্ষ করেন, ভারতের মানুষ আজ হোক বা কাল তাদের পরিত্যাগ করবেন। আর তখনই হবে Pseudo secularist-দের চরম শিক্ষা।

(লেখক কে. এন. মণ্ডল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

ব্যতিক্রমী রেল বাজেট : প্রত্যাশা এবং বিশ্লেষণ

অম্লানকুসুম ঘোষ

আকাশচুম্বি প্রত্যাশার চাপ আর প্রতীক্ষা যদি একসঙ্গে কার্যকর হয় তাহলে সেই প্রতীক্ষার অবসানের পর অর্থাৎ যে ঘটনার জন্য এই প্রতীক্ষা সেই ঘটনা ঘটার পর স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয় বিশ্লেষণ। প্রত্যাশার কতটা পুরণ হলো, কতটা বা অধরা রয়ে গেল অথবা হতাশা গ্রাস করল কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে তৎপর হয় সকলে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট অধিবেশন এইরূপ ঘটনার একটি নিদর্শন। মোদী সরকার দেশের অর্থনীতিতে বিপুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে উদগ্রীব সকলে তাকিয়ে ছিল সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশনের রেল বাজেট ও সাধারণ বাজেট-এর দিকে। দুটি বাজেটই প্রকাশিত। বর্তমানে আমরা বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসেবে রেল বাজেটকেই ধরছি।

এবারের রেল বাজেটের সম্পর্কে বিশ্লেষণে বলা যায় এই রেল বাজেটের মূল নিয়ন্ত্রক হলো অর্থনীতি। স্বাভাবিক ভাবেই যে কোনও বাজেটের মূল নিয়ন্ত্রক অর্থনীতিই হওয়া উচিত। কিন্তু ভোট রাজনীতির অমোঘ প্রভাবে আমাদের দেশে এযাবৎকাল পর্যন্ত রেল বাজেটের মূল নিয়ন্ত্রা ছিল রাজনীতি। তাই রেলমন্ত্রী কোন প্রদেশের তা নিয়ে উৎসুক্য থাকত সকলেরই। সেই প্রদেশের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রকল্প ও নতুন ট্রেন ঘোষণা থাকত অবধারিত। রেলমন্ত্রী হিসেবে নিজের রাজ্যের জন্য কতটা বরাদ্দ আনতে পারলেন সেই অনুযায়ী রেলমন্ত্রীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হোত। ক্ষুদ্র প্রাদেশিক স্বার্থ হয়তো আংশিকভাবে চরিতার্থ হোত কিন্তু জাতীয় সম্পদ রেলমন্ত্রকের সামগ্রিক বিকাশের পথ হোত কণ্টকাকীর্ণ। এবারের রেলবাজেট এই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠেছে। কোনো বিশেষ রাজ্যের জন্য প্রচুর বরাদ্দ হয়নি। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা বা তার জন্য বরাদ্দ ঘোষণা হয়নি বরং পুরোনো প্রকল্পগুলি সমাপ্ত করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। এর

রেল বাজেট পেশ করতে চলেছেন সদানন্দ গৌড়া।

সুফল হবে দু'রকম। প্রথমত, পুরোনো প্রকল্পগুলি তাড়াতাড়ি শেষ হলে তার জন্য হওয়া খরচ দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে হওয়া খরচের চেয়ে কম হবে অর্থাৎ রেলের অর্থ বাঁচবে আবার দ্রুত প্রকল্পগুলি চালু হলে রেলের আয়ও তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাবে যা পরবর্তী বাজেটগুলিতে রেলকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, অসমাপ্ত প্রকল্পের জন্য দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ফল ব্যয় করার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে টাকার জোগান বাড়ে, কিন্তু পরিষেবা বা উৎপাদনগত কোনো বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। যা সামগ্রিক অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর হয়। প্রকল্পগুলি সমাপ্ত হলে অন্তত পরিষেবাক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হয় ফলে এই অপ্রয়োজনীয় মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা হলেও এড়ানো যায়। বাজেট অনুসারে গত তিন দশকে প্রায় সাড়ে ছ'শো প্রকল্প ঘোষিত হয়েছে যার মধ্যে মাত্র তিনশো সতেরোটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। বাকিগুলি সমাপ্ত করতে আরও পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা লাগবে। এমতাবস্থায় জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিয়েও নতুন পথে হাঁটার সাহস দেখিয়ে রেলমন্ত্রক সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছে।

রেলমন্ত্রকের মৌলিক কাজ অর্থাৎ পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন যাত্রীদেব খাবার সরবরাহ, স্টেশনের সৌন্দর্যাবরণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে সরাসরি রেলের হাতে না রেখে পিপিপি (Private Public Partnership) মডেলে বেসরকারি হাতে দেওয়ার প্রস্তাব আছে এবারের বাজেটে। এর ফলে রেল বিভাগের নিজস্ব কাজের জটিলতা কমবে ও মৌলিক কাজগুলির দিকে আরও মনোযোগী হতে পারবে রেলকর্মীরা। অন্যদিকে পেশাদারি মানসিকতায় পরিষেবা প্রদানে অভ্যস্ত বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে খাবার বা অন্যান্য পরিষেবা পেয়ে যাত্রীরাও সন্তুষ্ট হবেন। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সংস্থাগুলিও চেষ্টা করবে যাত্রীদের খুশি করতে যাতে পরবর্তী বরাতটাও তারাই পায়।

পরিচ্ছন্নতার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় চল্লিশ শতাংশ বাড়ানো যা যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়ে যাত্রীসংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করবে। তাৎক্ষণিকভাবে এর কোনো ফল পাওয়া না গেলেও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এর সুফল পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

গোটা দেশে রেলের মোট সাড়ে এগারো হাজার প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে প্রহরীর ব্যবস্থা করা এবং রেলপুলিশে সতেরো হাজার নতুন নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বাজেটে, এই সিদ্ধান্ত

একদিকে যেমন রেল দুর্ঘটনা কমাবে, যাত্রীসুরক্ষা বাড়াবে, অন্যদিকে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে দেশের সামগ্রিক বেকারত্বের সমস্যার কিছুটা সমাধান করবে।

২০০২ সালের পর গত বারো বছরে রেলভাড়া বাড়েনি। অথচ cost index বেড়েছে অর্থাৎ টাকার real money value কমেছে অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রেলভাড়া কমেছে বলা যায়। কাজেই রেলভাড়া বাড়ানো এসময় একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিয়েও সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করেছে বর্তমান সরকার। এর ফলে রেলের অপারেটিং রেশিও বাড়বে অর্থাৎ রেলের অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও অক্সিজেনের জোগান হবে।

বেশ কিছু ভবিষ্যৎমুখী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এবারের বাজেটে যেমন বুলেট ট্রেন চালু, হীরক চতুর্ভুজের মাধ্যমে দেশের সবকটি প্রান্তকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রগুলিতে কোনো আলাদা বরাদ্দ হয়নি বরং এগুলিকে এফ ডি আই (Foreign Direct Investment)-র আওতায় এনে বাস্তবায়িত করার কথা বলা হয়েছে। এফ ডি আই-এর বিস্তারিত শর্তসমূহ এখনও জানানো হয়নি, কিন্তু অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা বলে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেই বিদেশী সহায়তা নেওয়া উচিত, তবে লগ্নির ব্যাপারটা নিজেদের হাতে রাখাই বাঞ্ছনীয়। লগ্নির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান হবে কিভাবে? সেকথা ক্রমশ আলোচ্য।

অর্থনীতি ও পরিবেশ উভয়ের পক্ষে একইসঙ্গে উপকারী এক নীতি নেওয়া হয়েছে এবারের বাজেটে। রেলভবন ও রেলস্টেশনের ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্যানেল বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র মনে হলেও এর ফল সুদূরপ্রসারী। দেশব্যাপী সব রেলস্টেশন ও রেলভবনের ছাদের মোট আয়তন প্রচুর। তাই এককালীন বিপুল খরচ করে সৌরবিদ্যুৎ-প্যানেল বসানো হলে পরবর্তীকালে তার থেকে নিখরচায় যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তা রেলের বিদ্যুতের নিয়মিত খরচ অনেক কমিয়ে দেবে। ফলে ভবিষ্যতে রেলের হাতে প্রত্যেক বাজেটেই এক বিশাল উদ্বৃত্ত থাকবে যা খরচ করা যাবে অন্যান্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে। এবং সৌরবিদ্যুৎ পরিবেশবান্ধব হওয়ায় এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্যও স্থিতিশীল থাকবে।

নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে কোনো জিনিসই হয়তো সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে পারে না। যার যেখানে হয়ত প্রত্যাশা কিছুটা অধরা থেকে গেছে। সেদিকগুলোর একটু আলোকপাত করা যাক। প্রথমত, বিভিন্ন বিষয়ে ব্যতিক্রমী হলেও একটি বিষয়ে রেল বাজেট পুরোনো ছকের বাইরে বেরোয়নি সেটি হলো উদ্বৃত্তের মাধ্যমে পরিকাঠামো নির্মাণ। অর্থাৎ রেলের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের বিয়োগফল বা উদ্বৃত্ত যা থাকবে সেই অর্থের দ্বারাই ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো নির্মাণ করা। ভারতীয় রেলমন্ত্রকে এই নিয়মেই এতদিন পরিকাঠামো নির্মিত হয়ে এসেছে। অপারেটিং রেশিও (মোট ব্যয় ও মোট আয়ের অনুপাত) ৯৪ শতাংশ হয়েছিল বলে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পরিকাঠামো নির্মাণে অসুবিধা হচ্ছিল, বর্তমান বাজেটে অপারেটিং রেশিও ৯১.৫ শতাংশে নামিয়ে এনে কিছুটা সাশ্রয় করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য আয়-ব্যয়ের বাইরে

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

চিরায়ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাবলী
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কৃত
আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ (চারখণ্ডে) ১০০০
সংস্কৃত মূলপাঠ ও টীকাসহ সরল বঙ্গানুবাদে
কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা (চারখণ্ডে) ৮০০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
প্রাচীন ভারতের আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়ন চিন্তা ৩০০
মহর্ষি সুশ্রুত বিরচিত
সুশ্রুত সংহিতা (চারখণ্ডে) ৮০০
মহর্ষি শার্ঙ্গধর বিরচিত
শার্ঙ্গধর ঃ চিকিৎসা সংগ্রহ ১৭৫
শ্রীচক্রপাণি দত্ত বিরচিত চক্রদত্ত ২২০
শ্রী রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদ সোপান ১০০
মহামতি শ্রীমৎ মাধবকর বিরচিত নিদান ৩৫০
(রোগবিজ্ঞান, রোগনির্ণয়-সংগ্রহ ও নাড়ীজ্ঞান রহস্য গ্রন্থ তিনটি সংযোজিত)
শ্রীমৎ রাখাল দত্ত কবিরাজ বিরচিত
আয়ুর্ব্বেদীয় ফলিত চিকিৎসাবিধান ২৭৫
মহর্ষি বাগভট অষ্টাঙ্গহৃদয় (দুইখণ্ডে) ৪০০
মহামুনি কণাদ বিরচিত
নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ ৭৫
আচার্য ভাবমিশ্র বিরচিত
ভাবপ্রকাশ (চার খণ্ডে) ১২০০
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য বিরচিত
রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ২০০
মহর্ষি বাগভট বিরচিত
রসরত্নসমুচ্চয় (দুই খণ্ডে) ৬০০
(রসরহস্য বিজ্ঞানম ও পরিভাষা প্রদীপ গ্রন্থ দুইটি সংযোজিত)
অধ্যক্ষ সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন কৃত
কায়চিকিৎসা ২৫০
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ বিরচিত
ভৈষজ্য রত্নাবলী (তিনখণ্ডে) ৭০০
অধ্যাপক আশীষকুমার মল্লিক
আয়ুর্ব্বেদ সিদ্ধান্ত ঃ দর্শন ও পদার্থসূত্র ২২৫
আয়ুর্ব্বেদ সংকলন ২২৫
(শারীরবিজ্ঞান, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা, আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস, সহজ রোগনির্ণয়)
সদ্য প্রকাশিত নতুন সংস্করণ
মহর্ষি চরক বিরচিত
চরক সংহিতা (প্রথম খণ্ড) ৩৫০
সূত্রস্থান।। নিদানস্থান।। বিমানস্থান।।
চরক সংহিতা (দ্বিতীয় খণ্ড) ৪০০
শারীরস্থান।। ইন্দ্রিয়স্থান।। চিকিৎসিত স্থান।। (প্রথমাংশ)
চরক সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড) ৩৫০
চিকিৎসিত স্থান (শেষাংশ)।। সিদ্ধিস্থান।। কল্পস্থান।।
দীপায়ন
২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কল-৯
☎ ২২৪১-৪১৫০
E-mail : deepayan07@gmail.com

থেকেও তো বিনিয়োগ করা যায়। সরকারের বিভিন্ন পরিকাঠামো বন্ডের মতো রেলমন্ত্রকের তরফ থেকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো বন্ড (অবশ্যই অধিক সুদযুক্ত) ছেড়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল টাকা তোলা যেতে পারে, তারপর সেই অর্থ কাজে লাগিয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করে ফেলা যায় খুব তাড়াতাড়ি। এতে দীর্ঘমেয়াদী ব্যয়গত অপচয় হয় না ফলে সরকারি খরচ কমে। আবার পরিকাঠামো উন্নত হওয়ায় রেলের সামগ্রিক পরিষেবার মান বাড়ে এবং সেই পরিষেবার বিক্রয়লব্ধ অর্থে রেলের ভাঁড়ার আরও পুষ্ট হয়। এই অর্থের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বন্ডের ফেরত অর্থের জোগানও হয়ে যায়। ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরাও উপকৃত হয় আবার রেলের দেশব্যাপী পরিকাঠামোর উন্নতি হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি হয়। অন্যদিকে এসব ক্ষেত্রে সম্ভাব্য লগ্নিকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে (এফ ডি আই-এর অন্তর্গত) লভ্যাংশ বিদেশে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত করা যায়। এভাবে বন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বুলেট ট্রেন, সৌরবিদ্যুৎ ইত্যাদি সব লগ্নির প্রয়োজনই মেটানো যেত। কিন্তু এবারের বাজেটে এই সংক্রান্ত কোনো পদক্ষেপ দেখা গেল না।

দ্বিতীয়ত, এবারের বাজেট অনুসারে রেলের ডিজেল-ক্রয় বাবদ সম্ভাব্য ব্যয় ২২ হাজার কোটি টাকা। যা গত বছর ছিল ১৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ একবছরে এই খাতে খরচ বেড়েছে ৯ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ৮ হাজার কোটি টাকার পুরোটাই বেরিয়ে যাচ্ছে এই খাতে। অথচ ডিজেল ক্রয়ের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র তিন শতাংশ। বাকি খরচ বৃদ্ধির কারণ ডিজেলের দাম বৃদ্ধি। ভবিষ্যতে এই দাম বৃদ্ধি আবার ঘটতে পারে সেই অনুসারে ছ'মাস অন্তর যাত্রীভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাবও রয়েছে বাজেটে। প্রশ্ন এই যে এই আমদানিকৃত পেট্রলিয়ামজাত ডিজেলের ওপর এত নির্ভরশীলতা কেন বজায় রাখবে ভারতীয় রেল? যখন বিকল্প হিসেবে বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন বর্তমান এবং ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বনির্ভর। অতএব দেশের মোট রেলপথের সম্পূর্ণ অংশকেই বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিন চলার উপযোগী এবং সব ট্রেনকেই বিদ্যুৎচালিত ইঞ্জিনবাহিত করা হোক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার জন্য প্রয়োজনে বন্ড দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার করা হোক। এর ফলে একদিকে যেমন বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভরশীল ডিজেল-ক্রয়ের বিপুল খরচ থেকে রেল মুক্তি পাবে (সেই উদ্বৃত্ত খরচ থেকে বন্ডের প্রদেয় অর্থের জোগান হবে) অপরদিকে পেট্রোলিয়াম আমদানি কম হওয়ার কারণে দেশের বাণিজ্যিক ঘাটতিও কিছুটা কমবে। এবারের বাজেটে কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো আলাদা উল্লেখ করা হয়নি।

তৃতীয়ত, ভারতীয় রেলের যাত্রীপিছু ভর্তুকি প্রতি কিলোমিটারে ২৩ পয়সা। এর একটা বড় কারণ বিনা টিকিটের যাত্রী। ২০১১-১২ সালে রেলমন্ত্রকের চালানো এক সমীক্ষা অনুযায়ী শিয়ালদহ-হাওড়া এই দুই স্টেশনকেন্দ্রিক শহরতলির লোকাল ট্রেনগুলির মোট টিকিট ফাঁকির পরিমাণ বছরে ৭৫৩ কোটি টাকা। তাহলে সামগ্রিক ভাবে গোটা এই খাতে রেলের কোষাগার থেকে ফাঁকি হয় কয়েক হাজার কোটি টাকা। এই অর্থকে কোষাগারে ফেরত আনার জন্য রেলপুলিশের মতোই বিপুল সংখ্যায় টিকিট পরীক্ষক (স্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক যাই হোক) নিয়োগ করা উচিত ছিল। এতে একদিকে রেলের যাত্রীভাড়া জনিত আয় বেড়ে (বিনা টিকিটের জরিমানাও এর মধ্যে ধার্য) রেলের যাত্রীপিছু ভরতুকী কমত অপরদিকে কর্মসংস্থানের বিস্তার ঘটে দেশের বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হোত। কিন্তু এ ব্যাপারেও বর্তমান বাজেট নীরব।

দীর্ঘদিনের স্থিতিজাড্যে অভ্যস্ত অনড় রথচক্র যখন প্রবল প্রচেষ্টায় গতিশীল হয় তখন শুরুতেই হয়তো পূর্ণ গতিলাভ করে না কিন্তু আশা থাকে যে একসময় তা পূর্ণগতিতে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। সেরকমই দীর্ঘদিনের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ-আকীর্ণ জগদ্দল পাথরের অপসারণ ঘটিয়ে রেলমন্ত্রক সবে যাত্রা শুরু করেছে। সব প্রত্যাশা হয়তো এখনও পূরণ হয়নি। সব মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি এখনও। কিন্তু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়ে এই আশা জাগিয়েছে সকলের মনে যে ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তন সাধিত হবে। সার্বিকভাবে তাই বলা যায় এ বছরের রেল বাজেট নতুন আশার আলো নিয়েই এসেছে জাতীয় অর্থনীতিতে। ■

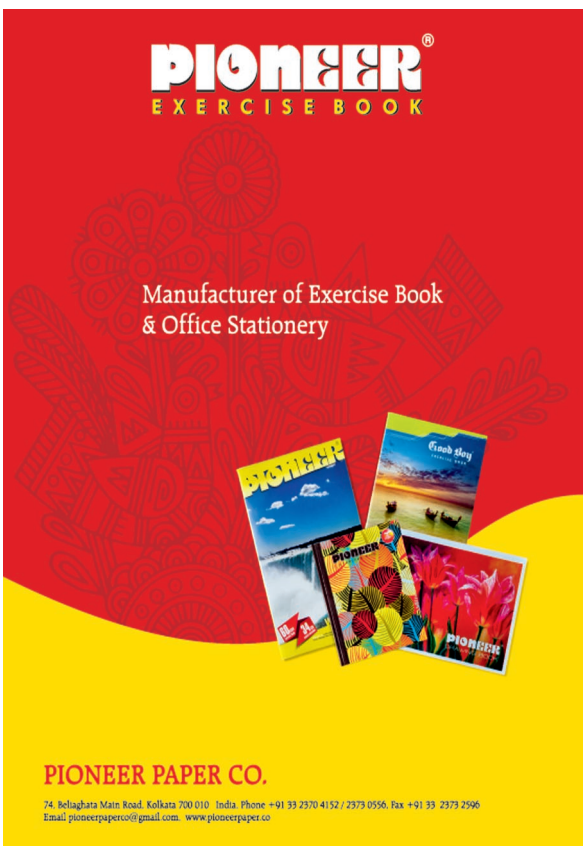

কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকারের প্রথম সাধারণ বাজেট-২০১৪

এ যেন ভারত-যাত্রার অরুণোদয়

এন. সি. দে

নতুন ভারতের স্বপ্নের দিশারি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট (এন ডি এ) সরকারের অর্থমন্ত্রী ১০ জুলাই, ২০১৪ পেশ করেছেন তাঁর সরকারের প্রথম সাধারণ বাজেট। প্রধানমন্ত্রীর মতো অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও বলেছেন, 'এ ভারতের জন্য ভারতীয় বাজেট'। কোনও বিশেষ রাজ্যের জন্য নয়, ভারতের সার্বিক বিকাশই এই বাজেটের উদ্দেশ্য। কোনো জাত-পাত-ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীকে খুশি করার জন্য এই বাজেট নয়। বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতা না দেখিয়ে বরং জাতীয় শিল্প-পুঁজির বিকাশের উপরেই বেশি জোর দেখানো হয়েছে।

সমগ্র ভারতের বিকাশের এই দীর্ঘ যাত্রায় সঙ্কীর্ণ রাজ্য-রাজনীতির কোনো জায়গা থাকা উচিত নয়। তবু বিরোধী দলগুলি তাদের সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে একযোগে এই যাত্রাভঙ্গে নেমে পড়েছে। যারা এই দু-মাস আগেও একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে, তারাই আজ সংসদে একযোগে বিজেপি বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের যে শাসকদল গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে হত্যা করে জাল-জুয়াচুরি, গা-জোয়ারি করে নির্বাচনে জিতে সংসদে প্রবেশাধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে, তারাই সংসদে জনদরদি সেজে গেছে। যে কংগ্রেস দল দেশের কৃষি-শিল্প-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিয়েছে, সেই দলই সংসদে আজ জনদরদি সেজে চূড়ান্ত অসভ্যতা করেছে। প্রাক্তন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রশ্ন তুলেছেন এই বাজেটে ঘোষিত প্রকল্পগুলি কীভাবে কার্যকর হবে তার দিশা নাকি এই বাজেটে নেই! পশ্চিমবঙ্গের

সাধারণ বাজেট পেশ করতে চলেছেন অরুণ জেটলি।

মুখ্যমন্ত্রীও 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পে ঘোষিত অর্থের পরিমাণ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। কারণ এঁরা জানেন, রাজকোষ তো আমরা ফাঁকা করে দিয়েছি, বিজেপি কি করে ভারত-বিকাশ ঘটায় দেখি?

কংগ্রেস জমানার একটু নিদর্শন এখানে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি, কারণ তা না হলে আজকের হঠাৎ জনদরদি হওয়া কংগ্রেস যে কতটা দেশদ্রোহী বিদেশের দালাল বিশ্বাসঘাতক তা বোঝা যাবে না। কংগ্রেস সরকার ২০০২-এ ক্ষমতায় এসেই দেশীয় শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে একের পর এক কৌশল নেয়। উৎপাদন শুল্ক ক্রমশ বাড়িয়ে চলে। পরিণামে শিল্প উৎপাদন এপ্রিল, ২০১২-তে নেমে যায় শূন্যেরও নীচে (০.৯ শতাংশ)। দেশের বাজারে যখন দেশীয় পণ্য শূন্য, তখন কংগ্রেস সরকার বিদেশী পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক (Import Duty) কমাতে কমাতে একেবারে তুলে দেওয়ায় দেশের বাজার চলে গেছে বিদেশী পণ্যের কব্জায়। শুরু হয় আমদানি-নির্ভর অর্থনীতি, রপ্তানি প্রায় কিছুই নেই। রপ্তানি মানে পণ্য-বিক্রি, আমদানি মানে পণ্য ক্রয়। কংগ্রেসের বাণিজ্য-ঘাটতি। ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্তও বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৮৮,৫৭৮ মিলিয়ন ডলার, ২০১২-১৩ সালে সেই ঘাটতি দাঁড়ায় ১,৯১,৬০০ মিলিয়ন ডলারে।

এই বাণিজ্য ঘাটতির মূল কারণই হলো কংগ্রেস সরকারের ইউরোমার্কিন পুঁজিপতিদের তুষ্ট করতে চাপিয়ে দেওয়া Free Trade Agreement (মুক্ত বাণিজ্য নীতি)। খোদ কংগ্রেসী বাণিজ্য-মন্ত্রীই স্বীকার করেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে যে এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে ৮০টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য করার জন্য।

এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির স্বাভাবিক পরিণাম রাজকোষ ঘাটতি, যা কংগ্রেস জমানায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। ২০০৬-০৭ সালেও এই রাজকোষ ঘাটতি ছিল ১,৪২,৫৭৩ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে খোদ কংগ্রেসী অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরমই জানিয়েছেন, এই ঘাটতি দাঁড়াবে আনুমানিক ৫,২৮,৬০০ কোটিতে।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তিন বছর ধরে কান্নাকাটি করে চলেছেন যে তার রাজকোষ সিপিএম শূন্য করে দিয়ে গেছে। চাপিয়ে গেছে ঋণের বোঝা। আমার এই ঋণ মুকুব করে দিতে হবে। দিতে হবে আরো কয়েক লক্ষ কোটি টাকা অনুদান। এই মুখ্যমন্ত্রীর তো অন্ততঃপক্ষে নরেন্দ্র মোদী সরকারের উপর এই বিপুল কংগ্রেসী ঘাটতি

সম্পর্কে দরদি হওয়া উচিত ছিল? তাঁর জেনে রাখা উচিত কংগ্রেস সরকারের রেখে যাওয়া অদেয় ঋণের বোঝা এক লক্ষ কোটি টাকার মতো। এর সবই শোধ না করে যাওয়া প্রতিশ্রুতি ভরতুকির টাকা। খাদ্য-ভরতুকি ৫০ হাজার কোটি টাকা, সার কোম্পানিগুলোর ভরতুকি ৩৮ হাজার কোটি ও তেল কোম্পানিগুলোর ভরতুকি ২৪ হাজার কোটি টাকা। এর উপর রয়েছে বিদেশি ঋণের বোঝা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতে, ৩১ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত এই ঋণের পরিমাণ ৪৪০.৬ বিলিয়ন ডলার। এছাড়াও প্রতি বছরই বাজেট ঘাটতি বোজাতে ঋণ করেছে কংগ্রেস সরকার। তার বোঝাও বড় কম নয়। ২০১১-১২ সালের বাজেটেই অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছে যে ঋণের সুদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৬৭,৯৮৬ কোটি টাকা। বর্তমানে তা কোথায় দাঁড়িয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটু চিন্তা করুন।

'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। স্বদেশের সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসীরাও ধর্মের কাহিনী শুনবে না। তাদের তা শোনানোও পণ্ডশ্রম। নরেন্দ্র মোদী সরকারের পথ দীর্ঘ। তা মসৃণও নয়, এইসব দেশবিরোধী দলগুলিকে কোনোমতেই জনদরদি সাজার সুযোগ করে দেওয়া চলবে না। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে থেকে বাজারি পত্রিকাগুলো নরেন্দ্র মোদীকে শিল্প বন্ধু, সংস্কারমুখী ইত্যাদি বলে প্রচার করছিল। উদ্দেশ্য নরেন্দ্র মোদীকে WTO নির্দেশিত তথাকথিত সংস্কারের জালে আবদ্ধ করে ফেলা। এই সংস্কার কোনোমতেই দেশের স্বার্থে নয়। দেশকে বিক্রি করে দেওয়ার স্বার্থে। ১৯৯১ সাল থেকে কংগ্রেস এই জালেই আটকে গেছে। মাকড়সার পেটে যাওয়া ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প নেই। ১৯৯১ সাল থেকে ভারত সর্বদিকে ক্রমশ পিছিয়েছে। ১৯৯১ সালে জি ডি পি-তে কৃষির অংশ ছিল ৩৫ শতাংশ; ২০০৮-০৯-এ তা নেমে দাঁড়ায় ১৭ শতাংশ। ২০০৩-০৪ বর্ষে বাজপেয়ী জমানাতেও কৃষি উন্নয়নের হার ছিল ১০ শতাংশ। ২০০৮-০৯-এ তা নেমে দাঁড়ায় ১.৬ শতাংশ। ২০০৪-০৫ বর্ষে কংগ্রেস জমানার প্রথম বছরেই এই হার নেমে গিয়েছিল শূন্যে। ডলারের দাম টাকার তুলনায় ক্রমশ বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে এক ডলারের দাম ছিল ৪ টাকা ৭৬ পয়সা; ২০১৩-র আগস্টে এই দাম দাঁড়ায় ৬৮ টাকা ৮০ পয়সায়। তাহলে এই আর্থিক সংস্কার কার স্বার্থে?

এই সংস্কারের জাল থেকে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে দূরে থাকতে হবে। এই সংস্কার সরকারকে জনবিরোধী করে তুলবেই। আর সেই সুযোগে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কংগ্রেসীরা জনদরদি সেজে আবার ক্ষমতা দখল করবে। আমাদের দেশের মানুষ সরল, সাদাসিধে, রাষ্ট্রচেতনা কংগ্রেস গড়ে তোলেনি। তাই তারা পুনরায় এদের ক্ষমতায় আনতে পারে। নরেন্দ্র মোদী সরকারের জনগণের উপর এক পয়সার বোঝাও চাপানো উচিত নয়। তাহলেই এরা জনদরদি সেজে মানুষকে বিপথে চালিত করবে।

নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ ভারত-বিকাশ যাত্রায় এবারের বাজেটে প্রকৃতই অরুণোদয় হয়েছে। জনগণের উপর কোনো বোঝা না চাপিয়ে সীমিত আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও অরুণ জেটলির এই বাজেট প্রশংসনীয়। একটি বাজেটের মাধ্যমেই ভারতকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার মতো ধৃষ্টতা তিনি দেখাতে যাননি। খুব সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সারা ভারতের বিকাশের জন্য সমস্ত রাজ্য, এলাকা, শিল্পক্ষেত্রে তিনি কিছু কিছু বরাদ্দ করেছেন। বছরের তিনমাস তো কেটেই গেছে, আরো ২-৩ মাস কেটে যাবে তা প্রয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাই কংগ্রেসীদের মতো বিপুল বরাদ্দ করে তা ব্যয় না করার চালবাজিতে তিনি যাননি।

যাত্রা সবে শুরু, যেতে হবে বহু দূর। উচ্চ-কারিগরি শিক্ষালয় (IIT), উচ্চ ম্যানেজমেন্ট শিক্ষালয় (IIM), বৃত্তি শিক্ষালয় (ITI) এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনের মাধ্যমে তিনি এক আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্রগঠনের দীর্ঘ পরিকল্পনা রচনা করেছেন। দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য Excise Duty (উৎপাদন শুল্ক) অনেকটাই কমিয়ে এনেছেন। বিদেশী পণ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে Inport Duty (আমদানি শুল্ক) বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিদেশী পুঁজিতে (FDI) দেশীয় কারিগরিতে সামরিক যন্ত্রাংশ তৈরির পরিকল্পনা করেছেন। এই মুহূর্তে বিদেশি পুঁজি প্রয়োজন, তাই বীমাতেও কিছুটা FDI আনার প্রস্তাব করেছেন। FDI আসার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি আইন পুনরায় সংশোধন করে দেশীয় শিল্পকে বিদেশী অধিগ্রহণের হাত থেকে বাঁচাতে কোম্পানি আইন পুনরায় সংশোধন করতে হবে। যে সমস্ত আইন কংগ্রেস সরকার বিদেশিদের অনুকূল করে দিয়েছেন, সেগুলো পুনরায় সংশোধন করাটা অত্যন্ত জরুরি।

মনে রাখতে হবে, বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও চুপচাপ বসে থাকে। তাদের দেশে লবি করাটা আইনসঙ্গত। তারা তাদের রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়েই এদেশের দালালদের মাধ্যমে নানান ষড়যন্ত্র করবেই। তাই ধীরে ধীরে এগোতে হবে। এবং 'হৃদয়ে রাখতে হবে দৃঢ় বিশ্বাস— আমরা করবো জয় নিশ্চয়, একদিন।'

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর
তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

পশ্চিমবঙ্গে ত্রাসের শাসন

চুপ, পশ্চিমবঙ্গে নাকি পরিবর্তনের শাসন চলছে! পরিবর্তনের নামে চলছে ত্রাসের শাসন। তাই একটিও প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন করলেই 'মাওবাদী' তক্‌মা দিয়ে গ্রেপ্তার। এখানে শাসকদলের সমালোচক হওয়ার অপরাধে জিজ্ঞাসাবাদের নামে বাইশ ঘণ্টা থানায় বসিয়ে রাখা হয়। এখানে যাঁরা খুনের দায়ে যুক্ত থাকবেন, অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকদের প্রহার প্রদান করবেন, গণধর্ষণে যুক্ত থাকবেন, তাঁদের একটু-আধটু বাড়াবাড়ি করে ফেলা 'দুষ্টু ছেলে' বলে শাসনের বাইরে রেখে দেওয়া হয়। তাইতো বিষবৃক্ষের বিকশিত ফুল হয়ে এই রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে দুলে দুলে আছে আরাবুল, মনিরুল, অনুব্রত, শুভ্রাংশু, শঙ্কুদেব, তন্ময় প্রমুখ। এদের সমস্ত অন্যায় পুলিশের কাছে ভ্যানিশ। প্রকাশ্য জঙ্গি আস্ফালনে মত্ত মহিলা বিধায়করা নির্বাচনী অফিসারকে মারধর করতে পারেন, ছাপ্পা ভোট দিতে পারেন। পুলিশ তাঁদের ধরে না। যদিও বা ধরে তবে সওয়াল করবার জন্য সরকারি উকিল নানা অজুহাতে অনুপস্থিত থাকেন। অন্যায়কারীর অনায়াসেই জামিন মিলে যায়।

সিন্ডিকেটরাজ আজ মুখ্যমন্ত্রীর লাল চোখকেও কেয়ার করে না। দলের প্রথম শ্রেণীর নেতা-নেত্রী, বিধায়কদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত অনুগামীরা এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত। দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য তৈরি হবে না উত্তরপাড়া ফিল্ম সিটি। একই কারণে স্নাতক স্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা বন্ধ। কলেজে কলেজে চলছে অশান্তি। বি এড কলেজে টাকা নিয়ে ভর্তি-দুর্নীতির ফলে রেজিস্ট্রেশন না পাওয়া নদীয়া, হুগলী, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ভুক্তভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকার।

কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রায় ৮০টি পুরসভার আসন্ন ভোট নিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল না থাকায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আদালত রাজ্য সরকারকে হলফনামার

চিঠিপত্র

আদেশ দিয়েছে। পুরভোটের আগে শুরু হয়ে গেছে পুরসভার নানান বদান্যতা। নিজের বাড়ির বাইরের রং নীল-সাদা করলে এক বছরের সম্পত্তি কর ছাড় দেওয়া হবে। দাহ্য জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসা করেন এমন ১৩টি ব্যবসা-সহ ৪৩ হাজার ব্যবসায়ী যদি তিন মাসের মধ্যে অগ্নিবিধি মানা হবে বা অগ্নি-নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমন মুচ্‌লেকা দেন তবে এক বছরের জন্য পুর-লাইসেন্স পেয়ে যাবেন। অথচ ভয়ঙ্কর এই শর্তের সময়সীমার মধ্যে কোনও অঘটন ঘটলে তার দায় কে নেবে? এমন প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কারুর জানা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পুরসভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদির নানা অনিয়ম- বেনিয়ম নিয়ে বিজেপি সমর্থকরা প্রতিবাদ করলেই তৃণমূল রক্তচক্ষু নিয়ে এগিয়ে আসছে। মারধোর করছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকছে। মানুষ আইনের পথে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গকে ত্রাসমুক্ত করার জন্য আগামীদিনে এর জবাব দেবে।

অমিত ঘোষ দস্তিদার,
সোনারপুর, কলকাতা-১৫০।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রয়োজন

পত্রিকায় সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের একটি অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সংখ্যালঘু কৃতী ছাত্রীদের হাতে উৎসাহভাতা, শিক্ষাঋণ-সহ অন্যান্য অনুদান তুলে দেন। ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''যাদের জন্য প্রয়োজন তাদের জন্য করতে হবে। পিছিয়ে পড়াকে এগিয়ে আনা আমাদের কাজ''। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ''আমি বলছি, বেশ করব। করা হবে''। ওই দিন আরও কিছু উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। যেমন--- পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির ইসলামপুর শাখা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্কসার্কাস ক্যাম্পাসের ছাত্রীনিবাস এবং ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউন ক্যাম্পাসে দু'টি পড়ুয়া নিবাসের শিলান্যাস করা হয়। প্রথম শ্রেণী থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি কর্মসূচির জন্য শিক্ষাঋণ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষার কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও সংবর্ধনা জানানো হয়। ঘোষণা করা হয় ১৪ আগস্ট কন্যাশ্রী দিবস পালিত হবে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী এপ্রিল ২০১১ থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত রাজ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নে ১৫৩৭ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। রাজ্যে তো আরও অনুন্নত মানুষ রয়েছে। জানতে ইচ্ছা করে তাদের জন্য কোথায় কত টাকা খরচ করা হচ্ছে? আর কোনো পিছিয়ে পড়াদের নিয়ে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কোনো অনুষ্ঠান করতে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাজকোষে তো সবারই সমান অধিকার।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে বর্তমান সরকার সরকারি অর্থে ইসলাম ধর্ম প্রচারে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। উদ্দেশ্য সরকারি অর্থ ব্যয় করে সিংহাসন দখলের নিশ্চয়তা বিধান করা। দুঃখের বিষয় নিজের অবিমৃশ্যকারিতার ন্যায্য প্রতিষ্ঠা দিতে মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তার শব্দচয়ন মুখ্যমন্ত্রীসুলভ নয়। আর রাজ্যবাসী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে।

দুলালকৃষ্ণ দাস,
চৌধুরীপাড়া রোড শেঠপুকুর,
বারাসাত, কলকাতা-২৪।

আসানসোলের উন্নয়ন

আমরা আসানসোলবাসী এই ভেবে গর্বিত যে, বাবুল সুপ্রিয়'র মতো ভালো, মিশুকে, কাজে চনমনে, নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী এক যুবককে সাংসদ হিসাবে পেয়েছি। তাঁর

ফঃ ৩

কাছে আমার আবেদন— এক, আসানসোল এলাকা ধোঁয়াদূষণে ঢেকেছে। তার একটা বিহিত করুন। কারণ এটা সার্বিকভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের প্রশ্ন। দুই, রেলপারে আন্ডারপাস চাই। তিন, কোর্টচত্বরে বাসস্ট্যান্ড। চার, বড়বাজার এলাকায় সংস্কার করে পরিকাঠামোর উন্নয়ন। পাঁচ, জল সমস্যার সমাধান। ছয়, বেকারত্ব ঘোচানোর জন্য বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা। সাত, সড়ক উন্নয়ন। আট, উড়ালপুল নির্মাণ। নয়, উন্নতমানের হাসপাতাল ও পার্ক তৈরি। দশ, উপনগরী নির্মাণ।

শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্তী,
আসানসোল, বর্ধমান।

থিওসফি ও থিওসফি সম্প্রদায়

২১.৪.২০১৪ তারিখের স্বস্তিকা-তে 'হিন্দুশাস্ত্রে পরলোকতত্ত্ব (থিওসফি)' শীর্ষক একটি রচনা পড়লাম। রচনাটির শিরোনাম বিভ্রান্তিকর; মনে হবে, হিন্দু শাস্ত্রের পরলোকতত্ত্ব এবং থিওসফি সমার্থক। লেখকের বক্তব্য সবই hypothetical; তথ্যসূত্রের কোনো উল্লেখ নেই। ফলে, জানার উপায় নেই হিন্দুশাস্ত্রের কোথায় কথাগুলি আছে।

থিওসফি বিষয়টি যে কি, রবীন সেনগুপ্তর লেখাটিতে সে সম্বন্ধে একটি কথাও নেই; যদিও উপসংহারে তিনি বলেছেন--- ''থিওসফি তাই বিষয় হিসাবে যথেষ্ট মনোযোগের দাবি রাখে।'' কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী ও রচনা'-তে আমরা সম্পূর্ণ উলটো কথা দেখতে পাই। আমেরিকা থেকে স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গাকে লিখেছিলেন— ''...ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিরা সকলেই থিওসফিস্টদের ভ্রান্ত মনে করে; আর তারা যে এরূপ মনে করে, তা ঠিকই...আমি থিওসফিস্টদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না; কিন্তু আমার ভাব হচ্ছে, তাদের একদম আমল না দেওয়া...''; আলমবাজার মঠ থেকে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে মিসেস বুলকে লেখা এক পত্রে স্বামীজী থিওসফিস্টদের ধ্যান-ধারণাগুলিকে 'আজগুবী' বলে উল্লেখ করে বলেছেন— ''...আমি যতদূর যা দেখেছি, তাতে ভারতে ইংলিশ চার্চের যেসব পাদ্রী আছে, তাঁদের উপর বরং আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিওসফিস্টদের... উপর আদৌ নেই''— ('বাণী ও রচনা'— প্রথম সংস্করণ— ৭/৬৯, ২১৬-১৭, ৩৩৫-৩৬)।

অতঃপর, থিওসফিস্টদের ব্যবহার প্রসঙ্গ। ধর্মমহাসভায় যোগদানের প্রস্তুতিপর্বে একটি পরিচয়পত্রের জন্য স্বামীজী থিওসফিক সোসাইটির একজন নেতার কাছে গিয়েছিলেন। 'ভারতপ্রেমিক' বলে পরিচিত ওই থিওসফিস্ট নেতার জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, তাঁদের সোসাইটিতে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, তিনি তাঁদের অনেক মতই মানেন না। সে কথা শুনে নেতা মহোদয় সাফ বলে দিয়েছিলেন— 'তবে যাও, তোমার জন্য কিছু করতে পারব না।' আমেরিকার ঘোরতর শীতে স্বামীজীর আশু শীতবস্ত্রের প্রয়োজন; তখন তাঁর কাছে শেষ সম্বল কয়েকটি ডলার মাত্র ছিল। অগত্যা, টাকার জন্য মাদ্রাজের বন্ধুদের তার করেন। থিওসফিস্টরা তা জানতে পেরে লিখেছিলেন— ''শয়তানটা শীঘ্র মরবে— ঈশ্বরেচ্ছায় বাঁচা গেল।'' ধর্মমহাসভায় স্বামীজী থিওসফিস্ট সোসাইটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার চেষ্টা করেছিলেন; সাড়া মেলেনি। ধর্মমহাসভায় থিওসফিস্ট প্রতিনিধিরা তাঁর দিকে যেভাবে তাকাতেন, তা স্মরণ করে স্বামীজী বলেছেন— ''তাঁদের সেই অবজ্ঞাদৃষ্টিতে যেন প্রকাশ পাচ্ছিল— 'এ একটা ক্ষুদ্র কীট; এ আবার দেবতাদের মধ্যে কি করে এল?''(ঐ; ৫/৯৫-৯৭)।

তাঁর প্রতি থিওসফিস্টদের ক্রোধ ও বিদ্বেষের কারণ উল্লেখ করে স্বামীজী রাখাল মহারাজকে লিখেছিলেন— ''...তুমি জান, তাদের দলে যোগ দিতে অস্বীকার করায় তারা আমাকে আমেরিকায় নির্যাতিত করেছে''। বিরূপভাবে অপর একটি কারণ, স্বামীজীর প্রভাবে থিওসফিস্টদের প্রতিপত্তি হ্রাস।

থিওসফিক্যাল সোসাইটি সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন— 'ওই সোসাইটির একটি এসোটেরিক (গুপ্ত সাধনা) বিভাগের মতো এই— 'যে কেহ উহাতে যোগ দেবে, তাহাকে কেবলমাত্র কুথুমি ও মোরিয়ার —তাঁহারা যাহাই হোন, তাঁদের নিকট শিক্ষা নিতে হবে। অবশ্য এঁরা অপ্রত্যক্ষ, আর এঁদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি মিঃ জজ ও মিসেস বেসান্ত। সুতরাং এসোটেরিক বিজ্ঞানে যোগ দেবার অর্থ এই যে, নিজের স্বাধীন চিন্তা একেবারে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে এঁদের নিকট আত্মসমর্পণ করা। অবশ্য আমি এরূপ করতে পারতাম না, আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকেও হিন্দু বলতে পারি না' (ঐ; ৭/৪৪৮)। উল্লেখ্য, মিঃ জজ ছিলেন সোসাইটির আমেরিকা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। রবীনবাবু লিখেছেন— ''অ্যানি বেসান্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটির নাম...''। সঠিকভাবে বলতে গেলে কথাটি হবে— 'মাদাম ব্লাভাটস্কির থিওসফিক্যাল সোসাইটির নাম...'। কারণ উক্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রুশ মহিলা মাদাম হেলেনা প্রেত্রোভ্না ব্লাভাটস্কি (১৮৩১-১৮৯১)। নিউইয়র্কে তিনি ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে উক্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে ভারতে এসে ১৯৮৬ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজের (অধুনা তামিলনাড়ু) আডিয়ারে সোসাইটির একটি দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। মিসেস অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) উক্ত সোসাইটির অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন, যেমন ছিলেন কলকাতা থিওসফিক্যাল সোসাইটির স্থাপয়িতা বিখ্যাত থিওসফিস্ট নেতা কর্নেল অলকট।

'মিসেস বেসান্ত ও থিওসফিক্যাল সোসাইটি সম্বন্ধে তাঁর কি মত', জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ 'মাদ্রাজ টাইম্‌স'-কে এক সাক্ষাৎকারে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৭) বলেছিলেন— ''...আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক ওদিক হতে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করেছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম আলোচনা করার অবসর তাঁর হয়নি... তিনি একজন সন্ন্যাসিনী কিন্তু 'মহাসা' 'কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নই। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটি ছেড়ে দিন এবং নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যা সত্য মনে করেন, তা প্রচার করুন'' (ঐ; ৯/৪৭৪-৭৫)।

বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

প্রাচীন ভারতে আজকের নলজাতক সন্তান

নীতিন রায়

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করলে মনে হয় ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা সেই পুরাকালেও হয়েছে। এমন সব পরম্পরা রয়েছে যা আজকের আবিষ্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখন আর সেই সব ঘটনাকে কল্পকথা বলে উড়িয়ে দেবার যো নেই। কেউ যদি বলে প্রাচীন ভারতের ক্লোনিং বা টেস্টটিউব শিশু জন্মানোর প্রথা চালু ছিল, তিনি মিথ্যা বলেন না। কুম্ভ বা যজ্ঞপাত্রে জন্মানো সন্তানের সংখ্যা কম নয়। 'কুম্ভ' বলতে কলসি জাতীয় পাত্রকে বোঝায়। কখনও একে যজ্ঞ পাত্র বলা হয়েছে। এই সন্তানদের অযোনিসম্ভব বা যজ্ঞসূত বা কুম্ভসূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী ক্লোনিং মানে কোনো প্রাণীর কোষ হতে উৎপন্ন নতুন প্রাণী। ক্লোনিং পদ্ধতি মেষের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞান সফল হয়েছে। 'টেস্ট টিউব শিশু' জন্ম হয় স্ত্রী এবং পুরুষের ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় থেকে বীজ নিয়ে তা টেস্ট টিউবে নিষিক্ত করে এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় নিষিক্ত বীজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি পাত্রে কিছুদিন রাখা হয়। এইভাবে তৈরি সন্তানদের অযোনি সম্ভব বলতে কোনো দোষ নেই।

ঔর্ব বাৎস্য গোত্রের অগ্রগণ্য এক ঋষি। হরিবংশ অনুযায়ী তাঁর পিতা উর্ব কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে তিনি উরু মন্থন করে এক সন্তানের জন্ম দেন তার নাম 'ঔর্ব'। হরিবংশে আছে— তিনি যজ্ঞাগ্নিতে উরু মন্থন করে ঔর্বের জন্ম দেন। তিনি মহারাজ রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ সগরেরও পূর্বপুরুষ। মহাভারতে আছে ভৃগু বংশীয় ও তাঁদের পুরোহিতরা সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। কৃতবীর্যের বংশধররা হত দরিদ্র হয়ে পড়েন এবং ক্ষত্রিয় দ্বারা নিহত হন। তখন তাঁদের স্ত্রীরা হিমালয়ে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁদের হত্যার জন্য ক্ষত্রিয়রা উপস্থিত হলে এক ব্রাহ্মণীর উরু মন্থন করে যজ্ঞাগ্নিতে ঔর্বের জন্ম হয়। দুই পুস্তকেই 'উরুমন্থন' যজ্ঞাগ্নিতে ঔর্বের জন্ম বলে স্বীকার করা হয়। উরু মন্থন মানে উরু থেকে কোষ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে মানুষ উৎপাদন করা হয়েছে বলে মনে হয়।

যুবানাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। আবার মান্ধাতার পুত্র মুচকন্দ। মান্ধাতার জন্মও রহস্যে ভরা। অপুত্রক যুবনাশ্ব পুত্র লাভের আশায় যজ্ঞ করেন। মুনিরা যজ্ঞ করে মন্ত্রপূতঃ জল কুম্ভে রেখে নিদ্রা যান। রাত্রিতে তৃষ্ণার্ত রাজা যুবনাশ্ব সেই জল পান করেন আর তাতে গর্ভসঞ্চার হয়। রাজার পার্শ্বদেশ ভেদ করে যে সন্তানের জন্ম হয় তাঁর নাম মান্ধাতা। পুরুষের গর্ভসঞ্চার হয় না। কিন্তু ক্লোনিং দ্বারা হুবহু নকল পুত্র সম্ভব।

অগস্ত্য মুনির কথা জানি। ঋগ্বেদ জানা যায় আদিত্য যজ্ঞের মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে কুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করেন। সেই কুম্ভ থেকে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়। অগস্ত্য মুনির অনেক নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে ঘটোদ্ভব বা কলসিসূত বা মৈত্রাবরুণী নামের উল্লেখ আছে। এ যেন টেস্টটিউব শিশু জন্মের মতোই কাহিনী।

তপোভূমি নর্মদার দক্ষিণ তটে বেদমতী আশ্রম। কুশধ্বজ স্বয়ং লক্ষ্মীমাতাকে কন্যা রূপে পেতে চান। তাঁর স্ত্রী মালাবতীর গর্ভে বেদমতীর জন্ম হয়। ৯ বছর বয়সে পুষ্করতীর্থে তিনি কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। রাবণ সেখানে অতিথি হন। অতিথি সেবার পর রাবণ কামাতুর হয়ে পড়েন। কিন্তু বেদমতী যোগবলে তার হাত পা জড়ীভূত করে দেন। এই অপমানের জ্বালায় তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং বলেন, ''এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি অযোনিজ কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করে তোর মৃত্যুর কারণ হবো,'' তিনিই সীতা। মা সীতা অযোনিসম্ভবা। তাঁকে রাজা জনক লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করার সময় পান। লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত বলে তিনি সীতা। বেদমতী থেকে সীতার জন্ম যেন ক্লোনিং পদ্ধতিতেই জন্ম।

মহর্ষি শিলাদ মহাদেবের বরে এক অযোনি সম্ভব পুত্র লাভ করেন। এই পুত্র নর্মদাতটে তপস্যা করে উচ্চকোটির ঋষিত্ব লাভ করেন। তিনিই একমাত্র ঋষি যিনি স্থূলদেহের দিব্যরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত শিবস্থানের রক্ষক। রাবণ কুবেরকে জয় করে পুষ্পক রথে চড়ে কৈলাশে প্রবেশ করতে যান। কিন্তু পুষ্পক রথ সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়, রাবণ তাঁর বানর মুখ দেখে হেসে ওঠেন। নান্দীকেশ্বর অভিশাপ দেন, 'আমার মতো বানরাকৃতি বিশিষ্ট মুখই তোমার হত্যার কারণ হবে।' তবে কি বানরসেনা সবই অযোনিসম্ভব ছিল? ভাবনাকে যদি গতানুগতিক ভাবে চালিত করি তবে এর উত্তর পাবো না কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মহাভারতে কুন্তীর সন্তান কর্ণ। তাঁর কর্ণ থেকে জন্ম। তবে কি

ক্লোনিং-এর সময় কর্ণ থেকে কোষ নেওয়া হয়েছিল? আমরা দেখতে পাই শুক্রাচার্য মৃত মানুষকে জীবিত করার বিদ্যা জানতেন। দেবতা-অসুরের যুদ্ধে তিনি এই বিদ্যা প্রয়োগ করেছিলেন। মহাভারত ও রামায়ণে নানা ধরনের অস্ত্র দেখতে পাই যা বিধ্বংসী। অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের কাহিনীও বিচিত্র।

আবার ঋষি ভরদ্বাজের পুত্র আচার্য দ্রোণও অযোনি সম্ভব। ঋষি ভরদ্বাজ নগ্ন অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামমোহিত হয়ে শুক্রপাত ঘটান। তা 'দ্রোণ' নামক যজ্ঞ পাত্রে রাখেন। দ্রোণের জন্ম সেই যজ্ঞপাত্র থেকেই। দ্রোণ পরবর্তীতে পাণ্ডব ও কুরু পুত্রদের অস্ত্র শিক্ষক। ভারত ইতিহাসের এক নায়ক।

দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যজ্ঞ হতে উৎপত্তি। রাজা দ্রুপদ দ্রোণ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হন। তাই তিনি এক পুত্র চান। দ্রুপদ যজ্ঞের আয়োজন করেন। দ্রৌপদীর অপর নাম যাজ্ঞসেনী। দ্রৌপদী ছিলেন আজন্ম যুবতী, শ্যামালাঙ্গী এবং আয়তনয়না। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের পতিরূপে বরণ করেন। দ্রোণ বধের আকাঙ্ক্ষায় গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে যাজ ও উপযাজ নামক দুই যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণের সাহায্যে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের আয়োজন করেন।

প্রাচীন ভারতে 'পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ' বলতে সন্তান উৎপাদনের এক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সন্তান উৎপাদন করা যেত। এই প্রযুক্তি মুনিঋষিরা আয়ত্ত করেছিলেন। অনেক আকাঙ্ক্ষিত মানে চাহিদানুযায়ী সন্তান উৎপাদন করা যেত। তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ছিল এবং সাধারণ সন্তানের ন্যায় তাদের আচরণ ছিল। দ্রৌপদী ও সীতা ছিলেন বধূ। এবং তাঁরা সাধারণ মানুষের মতোই সংবেদনশীল ছিলেন। দ্রোণ সেনাপতি ও শিক্ষক ছিলেন। বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য ছিলেন সুবিখ্যাত ঋষি। অর্থাৎ সমাজে তাঁদের স্থান ছিল উচ্চস্থানে। সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে তাঁদের সাধারণ মানুষের মতো কর্ম করার ক্ষমতার কথাই প্রকাশ করে।

এই প্রযুক্তির প্রয়োগ মহাভারতের অন্য একটি ঘটনায় জানা যায়। ভীষ্ম কাশীরাজ কন্যাদের হরণ করেন তাঁর ভ্রাতাদের বিবাহের জন্য। কাশীরাজ কন্যা অম্বা ভীষ্মকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু ভীষ্ম রাজি না হলে তার হত্যার কারণ হয়ে ওঠেন। এই অম্বা 'কুম্ভসূত' হয়ে শিখণ্ডী হন। অম্বালিকার দেহ কোষ থেকেই শিখণ্ডীর জন্ম হয়েছিল বলে মনে হয়। পুরাণ কাহিনী, মহাভারতে ও বেদে এমন সব ঘটনার বর্ণনা আছে যা আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে উঠবে। সব কিছুকে মিথ্যা কাল্পনিক বলে নিজেদের ছোট করার কোনো অর্থ হয় না। ■

পাঠ্য পুস্তক প্রসঙ্গ

সাজেশন — নবম-দ্বাদশ

সুপার নোটস্ বেস্ট সাজেশন, S. Roy সম্পাদিত UTTARAN PROKASHANI প্রকাশিত লেটার মার্ক এ+ বই।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত বহু শিক্ষক/ শিক্ষিকার প্রশংসাপ্রাপ্ত ৮০% থেকে ১০০% কমন দিতে সিদ্ধহস্ত একমাত্র সাজেশন্ বই লেটারমার্ক এ+ পড়ুন ও নিশ্চিন্তে পাশ করুন। প্রতি বই-এর মূল্য ৫০ টাকা।

গণিত

লোয়ার শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ঋক প্রকাশনীর সোনালী গণিত সম্পূর্ণ কালার অত্যাধুনিক গণিত বই। মূল্য ৬০ টাকা।

শিশু রচনা

রচনা বই :- দ্বিতীয় শ্রেণী হতে ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য। এই শ্রেণীর শিশুদের সমস্ত প্রকার পরীক্ষার জন্য শুধু একটি রচনা বই নয়, রচনার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ আমাদের লক্ষ্য। আমরাই প্রথম জন্মজাত দেশভক্ত ডাক্তারজীকে শিশু রচনা বই-এ অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রাপ্তিস্থান

এজেন্সীর জন্য বা ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন ঃ চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ৮/সি, ট্যামার লেন কলকাতা-৯। মোঃ- 9832043515 / 9635754004

সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

পৌরাণিক নগর প্রভাস

সোমনাথ মন্দির

গোপাল চক্রবর্তী

গুজরাটের জুনাগড় জেলায় সমুদ্রতীরে অবস্থিত প্রভাসপত্তন হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান। স্থানটি সোমনাথ পত্তন নামেও খ্যাত। বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির এই স্থানে অবস্থিত। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে প্রজাপতি দক্ষের ২৭ জন কন্যাকে বিবাহ করেন চন্দ্রদেব। কিন্তু একমাত্র রোহিণীর প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব দেখে অন্য কন্যারা পিতা দক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতা চন্দ্রকে নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়ার অভিশাপ দেন। শ্বশুরের শাপে চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে পড়লে দেবতাদের অনুরোধে দক্ষ শাপমুক্তির উপায় বলে দেন। এই তীর্থে আরাধনায় শিবকে তুষ্ট করতে পারলে শিবের কৃপায় ১৫ দিন ধরে ক্ষয় এবং ১৫ দিন ধরে ক্ষয় পূরণ হয়ে পূর্ণতা পাবেন সোম। সেই মতো সঙ্গমতীর্থে স্নান করে শিবের আরাধনায় বসেন সোম। আরাধনায় তুষ্ট শিব। ফলে জ্যোতি বা প্রভা তিনি ফিরে পেলেন। সেই থেকে এর নাম হয়েছে প্রভাস পত্তন বা সোমতীর্থ। আর ব্রহ্মার নির্দেশে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন সোম। পাশেই পাণ্ডব গুহা। শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপূরাণ, প্রভাস খণ্ড অনুযায়ী মহাত্মা বিদুর এই প্রভাসতীর্থে এসে নিজদেহ বিসর্জন দেন। বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এখানে এসেছেন। যুধিষ্ঠির তর্পণ ও তপস্যা করেছেন প্রভাসতীর্থে। সোমনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। গান্ধারীর শাপে এখানে যদুবংশ ধ্বংস হয়।

প্রভাস পত্তন ও সোমনাথ মন্দির ঘিরে ক্রমে এখানে গড়ে উঠেছিল জনপদ, তবে অরণ্যও ছিল। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার পর চিন্তাক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ একটি গাছে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় জরা নামে এক ব্যাধ দূর থেকে মৃগভ্রমে তির ছোঁড়ে। সেই তির শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিদ্ধ হয়। সেই তিরটি ছিল মুনিদের শাপে জাম্ববতী পুত্র শাম্বের প্রসব করা মুষলের ক্ষয়িত অংশ মাছের পেট থেকে পাওয়া। সেই তিরের আঘাতে কৃষ্ণের দেহান্ত হলো। বলা হয়, সেই বৃক্ষটি মহাকালের বেড়াজাল পেরিয়ে এখনও বর্তমান। অনুজের দেহাবসানে অগ্রজ বলরামও দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে অর্জুন এসে ত্রিবেণীর ঘাটে কৃষ্ণ বলরামের দেহ দাহ করেন। সেই স্মৃতিতে তৈরি হয়েছে দেহোৎসর্গ বেদি। কালে কালে গড়ে উঠেছে গীতা মন্দির। শ্বেত-মর্মরের মন্দিরে বিগ্রহ লক্ষ্মী-নারায়ণ। পাশেই বলরাম মন্দির, নাগস্থান বল্লভাচার্য তথা মহাপ্রভুর বৈঠক ছাড়াও নানা মন্দির। একটি গুহাপথও এসেছে পরশুরামের তপোভূমির সামনে থেকে গীতামন্দিরে। লোকশ্রুতি, এই গুহাপথ দিয়েই হানাদারদের হাত থেকে মন্দিরের ধনরত্ন রক্ষার চেষ্টা হয়েছিল।

প্রাচীনকালে এখানে একটি বৃহৎ বন্দর ছিল। মার্কোপলোর বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। এখন বন্দর ৪ কিলোমিটার দূরে ভেরাওয়ালে। ঐতিহাসিক আল্‌বিরুণীও সোমনাথ মন্দিরের প্রশংসা করেছেন। কথিত আছে সত্যযুগে সোমদেব মন্দির তৈরি করেন সোনা দিয়ে। ত্রেতাযুগে রাবণ তৈরি করেন রূপো দিয়ে এবং দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ চন্দনকাঠ দিয়ে সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেন। কলিযুগে এই মন্দির নির্মাণ করেন ভীমদেব। ৩০০ গায়ক, ৫০০ নর্তকী, ২,০০০ পুরোহিতের মস্তক মুণ্ডনের জন্য নিয়োজিত ছিল ৩০০ পরামাণিক। গঙ্গা থেকে জল আর কাশ্মীর থেকে ফুল এসেছে দেবপূজার জন্য।

৭২৫ খৃস্টাব্দে মন্দিরটি প্রথম ধ্বংস করে সিন্ধুর আরব শাসনকর্তা। অষ্টম শতাব্দীতে পুনর্নির্মিত মন্দিরটি ১০২৫ খৃস্টাব্দে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ। ২ দিনের যুদ্ধে মন্দির ধ্বংস হয়, লুণ্ঠিত হয় মন্দিরের ধনরত্ন, বিগ্রহের অলঙ্কার। এমনকী কারুকার্যময় স্তম্ভ ও চন্দন কাঠের দরজাগুলিও মাহমুদ সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এরপরে আনুমানিক ১০৩০ খৃস্টাব্দে গুজরাট ও মালবের রাজার যৌথ উদ্যোগে মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়। ১১৯৭ খৃস্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে এই মন্দির পুনরায় ধ্বংস হয়। রাজা মহীপাল আবার মন্দিরটির পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং শেষ করেন তার পুত্র খঙ্গর। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝিতে গুজরাটের শাসনকর্তা মুজফ্‌ফর খাঁ এই মন্দিরটিও ধ্বংস করে ধ্বংসাবশেষের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এরপর রাণী অহল্যাবাঈ এখানে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সোমনাথ মন্দির শেষবারের মতো ধ্বংস করে আওরঙ্গজেব। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের আগ্রহে পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর নবনির্মিত হয় মন্দিরটি।

সপ্তর্ষিদের স্কুলে গাছ লাগানো

কৌশিক গুহ

স্কুলে ‘এসো গাছ চিনি’ ক্লাস করতে করতে অনেক গাছ ভালোভাবে চিনে গেছে সপ্তর্ষি। ওদের সপ্তাহে দুদিন স্কুলের বাগানে এক ঘণ্টা করে ক্লাস থাকে। অজয়-স্যার গাছ চিনিয়ে দেন। প্রত্যেকটা গাছের উদ্ভিদ বিজ্ঞান অনুযায়ী নাম রয়েছে। আবার খুব চেনা ঘরোয়া নাম। রথের পরে বাগানে নতুন গাছের চারা পোঁতা হয়। যাকে বলে শিশুবৃক্ষ। গাছ না চিনলে খুব মুশকিল। অজয়-স্যার খুব উৎসাহ নিয়ে শেখান। হাতে কলমে কিংবা সরাসরি শেখার ব্যবস্থা। সপ্তর্ষিরা বেশ আনন্দ পায়। স্কুলে গাছ চেনার ক্লাস আছে শুনে অনেক অভিভাবক একটু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, ‘ছেলেরা কি মালি হবে?’ হেড স্যার জয়ন্ত ব্যানার্জি বলেছিলেন, ‘গাছ চেনা দরকার প্রত্যেকের। আপনাদের সেটা বোঝা উচিত। তারপরেও যদি আপত্তি থাকে তাহলে ছেলেকে নিয়ে যান।’ কোনো অভিভাবক নিয়ে যাননি ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে। কারণ সপ্তর্ষিদের স্কুলের যথেষ্ট নামডাক আছে। একসঙ্গে বাগানে কাজ করার মধ্যে আনন্দ আছে তা ছোটোরা বুঝেছে। কেউ কেউ বাড়িতে গাছ লাগিয়েছে। অজয়-স্যার অনেক চারা আনার ব্যবস্থা করেছেন। ছোট ছোট টবে গাছের চারা। চারাগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের হাতে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

গাছের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওদের।

ওদের স্কুলের বাগান ঘেরা। খুব বড়ো না হলেও বিঘে খানেক জায়গা। অজয় স্যারের তত্ত্বাবধানে ছবির মতো চেহারা নিয়েছে। কত যত্ন তাঁর। গাছগুলোর পাশে পরিচিতি লেখা। সপ্তর্ষি অবাক হয় গাছ কথা জানতে জানতে। কতরকম গাছ। গাছের রূপ একেকরকম। যখন প্রখর সূর্যতাপে চারদিকের মানুষ অস্বস্তিতে ভুগছে, গাছগুলো তাপে ঝলসে যাচ্ছে। আবার বৃষ্টির জল পেতেই খুশিতে গাছগুলো যেন নেচে উঠেছে। অজয়-স্যার বলেছেন, ‘প্রচুর গাছ লাগানো দরকার। আমাদের শহরে গাছ কমে গেছে। অক্সিজেন ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থ হয়ে পড়ছে অনেকেই। গ্রামেও কমে গেছে গাছ। লোকে যেমন খুশি কেটে ফেলছে।’ ছোটোরা মন দিয়ে কোনো কিছু শুনলে বা শিখলে তার প্রভাব থেকে যায় সারাজীবন। তারা বড়োদের বলে। সচেতনতা কিছুটা অন্তত তৈরি হয়।

সপ্তর্ষিদের পাড়ার বিনয়-জ্যেঠু কয়েক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিশ্রম করতেন। পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন। তাঁর প্রধান শখ ছিল উদ্যান চর্চা। গাছে গাছে ভরা ছিল তাঁর বাড়ি। অবসর নেওয়ার পর গাছের যত্ন বেশি করতেন। বয়স বাড়তে বুঝতে পারলেন অত গাছের যত্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় আর। পাড়ার ক্লাবকে দিয়েছেন। ক্লাবটা প্রতিবছর শীতে ফুল মেলা করে। বিনয়-জ্যেঠুর বাড়িতে এখন অল্প গাছ আছে। অজয়-স্যার বলেন, ‘প্রত্যেকে বাড়িতে গাছ লাগালে অনেকটা কাজ হবে। চারপাশ সবুজে ভরে গেলে পাখি আসবে। দেখে মন ভরে যাবে। তাজা বাতাস টেনে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। শরীর সহজে কাবু হবে না।’

সপ্তর্ষি কত গাছ চিনেছে। অন্যদের চিনতে সাহায্য করে। গাছ কেন বন্ধু হবে—একথা ছোটোদের বুঝিয়ে বলে। বড়োদেরও। ওদের পাড়ায় ছোটো বড়ো সকলে মিলে গাছ লাগানোর জন্যে রীতিমতো উৎসাহ দেখা যায়। গাছের যত্ন করতে ওরা শিখেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি এসব করায় বাড়িতে কেউ বারণ করে না। বরং উৎসাহ দেয়। ছোট ছোট গাছগুলো বড়ো হয়ে উঠলে দেখলে ভালো লাগে। অজয়-স্যার বলেন, ‘গাছ কিন্তু বুঝতে পারে তুমি তার শত্রু না মিত্র। তুমি মিত্র হলে সে খুশি হবে। আর শত্রু হলে গাছের কষ্ট হবে। গাছকে ভালোবাসলে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে অনেক বেশি।’

স্যারের কথাগুলো সবসময় মনে রাখে সপ্তর্ষি।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

গ্রামের লাইব্রেরি আর শিশির-জ্যেঠু

শিশির-জ্যেঠু দু'মাস ছাড়া গ্রামে আসে। একা আসে না। সঙ্গে জ্যেঠিমাও থাকে। পল্লবরা যে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে শিশির-জ্যেঠু তার সভাপতি। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রেসিডেন্ট। দু'মাস ছাড়া গ্রামে আসার সময় কিছু বই নিয়ে যেতে ভোলে না। অনেক লেখককে শিশির-জ্যেঠু চেনে। বইপাড়ার সঙ্গে কাজ। কয়েকজন লেখককে বলেছে, 'আমার গাঁয়ের ছোট্ট ছেলেরা একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে। আপনার একটা দুটো বই যদি দেন খুব ভালো হয়।' লেখকরা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছেন। পল্লবদের লাইব্রেরিতে কয়েকজন লেখকের উপহার দেওয়া বই আছে। চেনা প্রকাশকরাও কেউ কেউ বই দিয়েছেন। একটা ভালো কাজের জন্যে লোকজনের সাহায্য নিতে কখনও দ্বিধা থাকেনি শিশিরের। তার চেনা আরও অনেকে বই দিয়েছে গ্রামের ছেলেরা লাইব্রেরি করেছে জেনে। শিশির নিজে মাসে একশো টাকা আলাদা করে সরিয়ে রাখে। লাইব্রেরির বই কেনার জন্যে তার ব্যক্তিগত সাহায্য। আগে গিন্নিকে লুকিয়ে টাকাটা রাখত। জানলে অশান্তি হতে পারে— এমন ভেবে।

একদিন গিন্নিই বলল, 'তুমি ভালো কাজে যদি কিছু টাকা দাও আমার আপত্তি থাকবে কেন? আমাকে কি তোমার বইয়ের শত্রু মনে হয়?' শিশির খুব খুশি হয়েছিল। টাকা জমা রাখে গিন্নির কাছেই। দু'মাস বাদে বই কেনার সময় টাকা চাইতে দু'শোর জায়গায় তিনশো আসে। শিশির অবাক হয়ে তাকায়। গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, 'তোমারই টাকা, সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে আমিও দিলাম।' আনন্দ যেন ধরে না শিশিরের মনে।

বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বই কিনে আনে গ্রামে যাওয়ার দুদিন আগে। ব্যাগ ভর্তি হয়ে যায় বইয়ে। অন্যান্য জিনিসও থাকে। ছোটোদের জন্যে খেলনা চকোলেট নেয়। প্রতিবারই শিশির সঙ্গে নেয় গিন্নিকে। রবিবার খুব সকালে ট্রেন ধরে হাওড়া থেকে। পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে বাসে চড়ে ঘাটালের গ্রামে যেতে হয়। ছেলের দল আগে খবর পেয়ে যায়। তারা ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে বাড়িতে চলে যায় আগে। শিশির গিন্নিকে নিয়ে আস্তে আস্তে পৌঁছোয়। আসার পথে কতজনের সঙ্গে দেখা। দুচার কথা বলতেই হয়। বাড়িতে সবাই তৈরি। শিশির একটু হইচই পছন্দ করে বলে বেশ খুশির ঢেউ বয়ে যায়। হাত মুখ ধুয়ে কিছু খাওয়ার জন্যে তাড়া দেয় শিশিরের পিসি। ততক্ষণে ব্যাগ থেকে বই আর অন্য জিনিস বেরিয়ে গেছে। ছেলেরা বই দেখছে। তার ফাঁকে খাবার খেয়ে নিল শিশির। আর একটা ব্যাগ থেকে কিছু উপহারের জিনিস বের করে নাম ধরে ধরে একেকজনকে দিল পল্লবদের জ্যেঠিমা।

দুটো আলমারি নিয়ে রণতোষ রায়দের বাড়িতে লাইব্রেরি। শিশিরদের বাড়ির কয়েকটা বাড়ির পরেই। ওদের একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছে। আলমারি টেবিল চেয়ার দিয়েছে। রণতোষ কলকাতায় থাকে। বছরে দুবার আসে। পল্লবরা জানিয়ে দিল শিশির-জ্যেঠুকে সব বৃত্তান্ত। কতজন বই দিচ্ছে নিচ্ছে— এই খবরও জানা হয়ে গেল। বিকেলে লাইব্রেরি লাগোয়া বারান্দায় গান আলোচনা আবৃত্তির অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করল। অনুষ্ঠান শেষে একটু খাওয়া। সোমবার সারাদিন লাইব্রেরির বই গোছালো সকলে মিলে। মঙ্গলবার দুপুরের পর কলকাতা ফেরার জন্যে বেরিয়ে পড়া। পল্লবরা এগিয়ে দিয়ে যায়। সঙ্গে বোঝা থাকে। বাড়ি থেকে দিয়েছে কিছু জিনিস তাতে ব্যাগ ভর্তি। পল্লবরা কয়েকটা বই আনার জন্যে বলেছে শিশির-জ্যেঠুকে। সেই তালিকা যত্নে রয়েছে জামার পকেটে।

বইমিত্র

পড়া আর পড়ানোর কাজ

আদর্শ জননী কুন্তী

শতভিষা সরকার

আদর্শ জননী কুন্তী ধৈর্য, ক্ষমা ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতিমা। যদুবংশীয় শূরের পুত্র বসুদেব ও কন্যা পৃথা। সিদ্ধি দেবীর অংশে পৃথার উৎপত্তি। তিনি অতিশয় রূপবতী। শূরের পিসতুতো ভাই কুন্তিভোজ অনপত্য থাকায়, শূরের কাছে একটি সন্তান প্রার্থনা করলে শূর তাঁর কন্যা পৃথাকে দান করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা বলে পরে পৃথার নাম হয় কুন্তী। পিতা তাঁকে কুন্তিভোজের কন্যারূপে দান করেছিলেন এর জন্য কুন্তী মনে মনে দুঃখ অনুভব করতেন। কুন্তী জীবনে কখনও শান্তি পাননি। তিনি বীরপ্রসূ, তিনি পঞ্চপাণ্ডবের মাতা। তবু তাঁর সুখ-শান্তি কিছু ছিল না। তাঁর ন্যায় রূপবতী ও গুণবতী কন্যার ভাগ্যে যে কেন বিধাতা এমন দুঃখ লিখে রেখেছিলেন, তা কে জানে!

তবে তাঁর দুঃখের একটি অন্যতম কারণ, নারীসুলভ অহেতুক কৌতূহল। উগ্রতপাঃ দুর্বাসার কাছ থেকে পুত্র লাভের মন্ত্র পেয়েই কৌতূহলবশত কন্যা অবস্থায় তিনি কর্ণের জন্ম দেন এবং সদ্যোজাত কর্ণকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। এই ঘটনা তাঁর মনে এমন আঘাত করে যে, জীবনের কোনো অবস্থাতেই তিনি সুখী হতে পারেননি। তাঁর শূন্য হৃদয় চিরজীবন তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে। আরও একটা অবিমৃষ্যকারিতা তাঁর সুখ-শান্তির অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। কুন্তী জানতেন যে, পঞ্চপুত্র ভিক্ষা করতে বাইরে গেছে, বর্ষণ মুখর রাত্রে ভিক্ষালব্ধ বস্তু এনে গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে জননীকে ডেকে ভীমার্জুন বললেন— 'মা ভিক্ষা এনেছি'। জননী দরজা না খুলেই সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন— 'ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্বে'— সকলে মিলে ভোগ কর। তারপর দরজা খুলে নববধূকে দেখে তার দুশ্চিন্তার অন্ত রইল না। দ্রৌপদীর প্রতি এই অন্যায় আচরণের জন্য তিনি সারাজীবন শান্তি পাননি। দুর্ভাগ্যতাড়িতা কুন্তী চরিত্র যেমন বিস্ময়কর তেমন আদর্শস্থানীয়া।

কুন্তী রাজকন্যা, রাজবধূ, রাজমাতা। তবে মাতা হিসেবেই তিনি অধিক বিকশিতা, অধিক পরিচিতা। স্বামী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর কুন্তী আপন তিন পুত্র এবং দুই সতীনপুত্র নিয়ে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বসবাস করতে থাকেন। সেই সময় কুন্তী বিস্ময়কর ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। এই দিনগুলি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুঃখময় হলেও ততোধিক ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে তিনি সেগুলি অতিবাহিত করেছেন। বারণাবতে

জতুগৃহে দুর্যোধন পঞ্চপাণ্ডবকে পুড়িয়ে মারার যে চেষ্টা করেছিলেন, সেই ভয়ানক বিপদ থেকে উদ্ধার করে কুন্তী পাঁচ পুত্রকে নিয়ে বনপথে পদব্রজে পাঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হন। সেখানে অর্জুন স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং পাঞ্চালরাজের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করলে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সাহায্যে কুন্তী ও তাঁর পুত্রদের হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। তারপর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে কুরুরাজ্যের অর্ধাংশ নিয়ে যুধিষ্ঠির সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। কুন্তী এতদিনে রাজমাতা হলেন। কিন্তু তাঁর কপালে সুখ নেই। দুর্যোধন ও শকুনির ছলনায় পাশা খেলায় পরাজিত হয়ে সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ বনবাসে গেলেন সুদীর্ঘ বারো বছরের জন্য। তারপর আরও একবছর অজ্ঞাতবাস। এই সময়ে কুন্তী ছিলেন বিদুরের গৃহে। বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের পর পঞ্চপাণ্ডব ফিরে এসে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেবার দাবি জানালে দুর্যোধন অসম্মত হন এবং কুরুক্ষেত্রে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ শেষবারের মতো সন্ধির চেষ্টা করেন। তিনি স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুর রাজসভায় উপস্থিত হন। হস্তিনাপুরে পৌঁছে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য সর্বাগ্রে কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুন্তী বলেন, কোনো অপমানকর শর্তে যেন সন্ধি না করা হয়। কুন্তী দ্রৌপদীর প্রতি কৌরবদের অপমানকে কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। পঞ্চপাণ্ডব অপেক্ষা দ্রৌপদী তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয় ছিলেন। কুন্তী বিদুরকে সর্বাধিক সম্মান করতেন। কারণ বিদুর ন্যায্য কথা বলতে পারতেন। দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসনের অমানবিক ব্যবহারের প্রতিবাদ একমাত্র বিদুরই করেছিলেন।

জীবনের একটি ক্ষেত্রে কুন্তী একটু দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার আসল পরিচয় জ্ঞাপন করা। কিন্তু তাতেও যুদ্ধ রোধ করতে পারেননি।

যুদ্ধের ষোল বছরপর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হিমালয়ে গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কুন্তীও তাঁদের সঙ্গে বানপ্রস্থে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেউ তাঁকে বিরত করতে পারলেন না। কুন্তী সবসময় তাঁর পুত্রদের যুদ্ধ করে ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এতদিন পরে তাঁর বাসনা পূর্ণ হয়েছে— যুধিষ্ঠির আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের অধিপতি হয়েছেন। এখন তিনি বিষয় সুখ উপভোগ করবেন। কিন্তু কুন্তী সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি চললেন বনবাসে। এই ত্যাগের মধ্যেই কুন্তীর মহিমা। এখানেই তিনি আদর্শ নারী— আদর্শ মাতা। বানপ্রস্থে যাবার আগে তিনি পুত্রদের বলেন— ''নাহং রাজ্যফলং পুত্রাঃ কাময়ে পুত্রনির্জিতম্। / পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো।।'' বানপ্রস্থে কুন্তী শান্তি ও সন্তোষের মধ্যেই ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধীজীর প্রতি তাঁর সেবাযত্ন ছিল বিস্ময়কর। তাঁর জীবন যেমন ছিল মহৎ, জীবনের পরিণতিও ছিল তেমনই মহৎ। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে ধ্যানমগ্না অবস্থায় শান্ত সমাহিতভাবে দাবানলে আত্মোৎসর্গ করেন।

লোকসভায় কোনো দলেরই বিরোধী পদমর্যাদা পাওয়া আইনত বৈধ নয়

অতিথি কলম

সুভাষ সি কাশ্যপ

কিছু কায়েমী স্বার্থধারী লোক যতই বাজার গরম করুক না কেন নব গঠিত ১৬তম লোকসভায় আইনত বিরোধী দলের মর্যাদা পাওয়ার অধিকার কোনো দলেরই নেই। অথচ এই সম্পূর্ণ অবিতর্কিত বিষয়টিকে নিয়ে পরাজিত কিছু দলের পক্ষ থেকে এই পদটি হাতিয়ে নেওয়ার অবিরাম চেষ্টা চলছে।

সংসদের আইন ও সংসদ পরিচালনার বিধি অনুযায়ী বিরোধী দলনেতার যোগ্যতা পাওয়ার মাপকাঠি সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি এক ধরনের সংসদীয় আইনের (Statute Law) অন্তর্গত। তা থেকে খেয়ালখুশি মতো বিচ্যুত হওয়া যায় না। এই মর্মে সংসদে বিরোধী দলনেতার পদে আসীন হতে গেলে মোট সাংসদ সংখ্যার (৫৪৩) ১০ শতাংশে সেই নেতা বা তাঁর দলের থাকা বাধ্যতামূলক। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আবশ্যক সংখ্যাটি ৫৫। এই

"সংসদের আইন ও সংসদ পরিচালনার বিধি অনুযায়ী বিরোধী দলনেতার যোগ্যতা পাওয়ার মাপকাঠি সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি এক ধরনের সংসদীয় আইনের (Statute Law) অন্তর্গত। তা থেকে খেয়ালখুশি মতো বিচ্যুত হওয়া যায় না। এই মর্মে সংসদে বিরোধী দলনেতার পদে আসীন হতে গেলে মোট সাংসদ সংখ্যার (৫৪৩) ১০ শতাংশে সেই নেতা বা তাঁর দলের থাকা বাধ্যতামূলক।"

নির্ণায়ক সংখ্যাটির কার্যকারণ ঐতিহাসিক বৃটিশ সংসদীয় নীতি ও প্রকরণের অনুসারী।

দেশের ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভায় ৩০ সদস্যের তদানীন্তন অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টিই ছিল এককভাবে সর্বাধিক সাংসদের দল। প্রসঙ্গত সেই সময় তাদের সংসদীয় বিরোধী দল নয় একটি বিরোধী গোষ্ঠী বলেই মান্য করা হোত। দ্বিতীয় লোকসভায় আবার নিদেন পক্ষে এই গোষ্ঠী বলে বিবেচিত হওয়ার ন্যূনতম সংখ্যা ৩০-ও কোনো দলের আয়ত্তে ছিল না। তৃতীয় লোকসভার ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট দলের আসন সংখ্যা পুনরায় ৩৪-এ পৌঁছনোয় তাদের বিরোধী গোষ্ঠী বলে ধরা হোত। চতুর্থ অর্থাৎ ৬৭'র লোকসভায় সর্বাধিক ৪৫ সদস্যের স্বতন্ত্র পার্টিকে যা বর্তমান কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৪৪-এর থেকে একটি বেশি তাদের বিরোধী-গোষ্ঠীর প্রধান বলে বিবেচনায় আনা হোত। দেখা যাচ্ছে এই চারটি লোকসভাতেই কোনো দল ন্যূনতম সংখ্যা মান পার করতে না পারায় কেউই সরকারিভাবে বিরোধী দলের মর্যাদা পায়নি। যেমন চতুর্থ লোকসভায় জনসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসে বিভাজন ঘটলে কংগ্রেস (organisation) নামধারীরা ৬০ সদস্যের দল হওয়ায় সর্বপ্রথম বিরোধী দলের তকমা পায়। স্বাভাবিকভাবে এই দলের নেতাও হন ঘোষিত বিরোধী দলনেতা। এই অবস্থা মাত্র এক বছর বলবৎ ছিল। পঞ্চম লোকসভাতেও বিরোধী দল শুধু নয় নির্বাচিত কোনো ৩০ সদস্যের একক বিরোধী গোষ্ঠীও ছিল না। জরুরি অবস্থা-পরবর্তী ১৯৭৭ সালের ষষ্ঠ লোকসভায় ১৫৩ সদস্যের জনতা দল অনান্য দলের সাহায্যে ক্ষমতাসীন হয়। কংগ্রেস বিরোধী আসনে বসে। এর পরে আবার কংগ্রেস ও জনতা দলে ভাঙন ধরায় কংগ্রেস (ইন্দিরা) ৫৮ সদস্য ও জনতা দল ভেঙ্গে ৬৮ সদস্যের বিরোধী দল তৈরি হওয়ায় তারা উভয়েই সংসদীয় বিরোধী দল হিসেবে গণ্য হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮০-৮৯ এর সপ্তম ও অষ্টম লোকসভার ক্ষেত্রে জনতা দল (সেকুলার) ৪১ সদস্য ও অষ্টম সংসদে তেলুগুদেশম ৩০ সদস্যের দল হওয়ায় কেবলমাত্র বিরোধী গোষ্ঠী বলেই পরিচিত ছিল। এবার ১৯৮৯ থেকে ২০১৪ সময়সীমায় নবম থেকে পঞ্চদশ লোকসভায় ৫৫ সদস্য থাকার মাপকাঠিটি পূর্ণ হয়েছিল। তাই বিরোধী দলনেতার পদমর্যাদাধারী নেতারা ছিলেন।

অতীত পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান :

আগের ঘটনাক্রম অনুযায়ী সংসদীয় ব্যবস্থা ও কার্যক্রম অতীত উদাহরণ ও প্রয়োগ অনুযায়ীই চলে এসেছে। এই সংসদীয় রীতিনীতি কোনো বিচ্যুতি ছাড়াই ১৯৫২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্তই বলবৎ রয়েছে। পর্যালোচনায় আপনারা নজর করেছেন কখনই নির্দিষ্ট ৫৫ সংখ্যা

অর্জনে ব্যর্থ কোনো দলই বিরোধী দলের মর্যাদা পায়নি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা গেল সংসদে দীর্ঘকালীনভাবেও বহু সময় কোনো নির্দিষ্ট বিরোধী নেতা ছিল না। এই মর্মে সংসদে পাশ হওয়া আইনও খুব প্রাঞ্জল।

লোকসভার অধ্যক্ষের সম্মতিক্রমে সর্বাধিক (৫৫ অধিক) সংখ্যক সদস্যের দলটিই সরকারি ভাবে বিরোধী দল ও তাদের নির্ধারিত নেতাই বিরোধী দলনেতা হওয়ার যোগ্য। এই দলনেতাই ১৯৭৭ সালের সংসদীয় আইন মোতাবেক তাঁর মাইনে ও নানান ভাতা ও সুযোগ সুবিধে পাওয়ার অধিকারী হবেন। সম্প্রতি মাত্র ৪৪ সদস্যের কংগ্রেস দলের নেতাকে সংসদীয় আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে যাঁরা বিরোধী দলনেতা বানানোর দাবি তুলছেন তাঁরা নানান অর্থকরী সুবিধে ও সংসদীয় মর্যাদা আদায়ের অবৈধ চেষ্টা করছেন। সুবিধেজনকভাবে তাঁরা লোকসভা অধ্যক্ষের অধিকার ও প্রাসঙ্গিকতাকেও এড়িয়ে চলেছেন। মনে রাখতে হবে, অধ্যক্ষও কিন্তু খামখেয়ালিভাবে বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কোনো কাজ করার অধিকারী নন। তাঁকে সংসদীয় আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হয়। তাঁকে সর্বদাই ১২১ (সি) ধারার অন্তর্গত সমগ্র লোকসভার মোট সংখ্যার ১০ শতাংশ আসনের অধিকারীকেই শুধুমাত্র বিরোধী দলনেতার পরিচিতি দিতে হবে। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো স্থান নেই। আর এটাও যাঁরা বলছেন ১৯৭৭-এর আইনের প্রেক্ষাপটে এই ধারাটি এখন তাঁবাদি হয়ে গেছে, কেননা এটি প্রথম লোকসভা অধ্যক্ষ শ্রীমভলঙ্কারের সময়কার। তাঁদের জানা দরকার ১৯৭৭ সালের সংশোধনী পাশ হওয়ার পরেও ১৯৮০-৮৯ সালের সপ্তম ও অষ্টম লোকসভাতেও কোনো বিরোধী নেতার অস্তিত্ব ছিল না। তখন ক্ষমতায় ছিল কিন্তু কংগ্রেস। এর পরেও না মানলে দেখতে হবে ১৯৯৮ সালে লোকসভা অধ্যক্ষ ও বিরোধী চিফ হুইপদের সম্মতিসাপেক্ষে মেনে নেওয়া হয় বিরোধী দলনেতা বলতে শুধু তাঁকেই বোঝাবে যিনি ৫৫ সদস্যের কোনো দলকে নেতৃত্ব দেবেন। এই একই আইনের আওতায় বলা আছে, ন্যূনতম ৩০ থেকে ৫৪ সদস্য থাকলে সেই সদস্যদের গোষ্ঠী হিসেবে সংসদে গণ্য করা হবে। এই বিষয়ে অধ্যক্ষের কোনো ভূমিকা নেই। চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংসদের অধ্যক্ষ কখনই উপযাচক হয়ে কোনো দলকে মূল বিরোধী দল বা বিরোধী গোষ্ঠী বলে ঘোষণা করেন না। কেবলমাত্র কোনো দলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো যোগ্য অনুরোধ পেলে তবেই তিনি তা বিবেচনা করেন।

শুভানুধ্যায়ীরা ও কর্তব্য :

এই পূর্বাপর পটভূমিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে উৎসাহী গোষ্ঠী হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বা অধ্যক্ষা শ্রীমতী মহাজনকে অযাচিতভাবে মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা ও বিশাল হৃদয়বেত্তার পরিচয় দিয়ে কংগ্রেস দলের নেতাকেই বিরোধী দলনেতার পদ পাইয়ে দেবার আবদার করছেন। তাঁরা আসলে জনগণের টাকা বেআইনিভাবে তাঁদের মনোমতো ব্যক্তিকে পাইয়ে দিতে চাইছেন। কারণ বেতন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুবিধে এই পদাধিকার বলে প্রাপ্য। মনে রাখা ভাল, প্রথা ভেঙ্গে যদি এই কাজ করাও হয় তা পত্রপাঠ আদালতে চ্যালেঞ্জ হবে এবং বেআইনি কাজ বলে ঘোষিত হবে।

এখন যুক্তিযুক্তভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সিভিসি, সিআইসি, লোকপাল ইত্যাকার সংস্থার শীর্ষপদাধিকারীদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিরোধী দলনেতার ভূমিকা কে পালন করবে? এক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনবে। বেআইনি কাজ যাতে না করতে হয় তার জন্যই ৩০-৫৪ এর মধ্যে সর্বাধিক সদস্যের দলকে সংসদীয় গোষ্ঠীর মান্যতা দেওয়ার বিধান তো রয়েইছে। এমনটা হতে পারে ধরে নিয়েই তো এই বিকল্প ব্যবস্থা। সরকার অনায়াসে সেই পথেই যাবে।

(লেখক লোকসভার ভূতপূর্ব সেক্রেটারী জেনারেল ও ভারতীয় জাতীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি)

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

**** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.**
**** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.**
**** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.**
**** Anti-Termite & Pest Control Treatment**

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com,
web : www.calcuttawaterproofing.com

ছিট বিনিময় হোক, কিন্তু শক্তিপীঠ বোদেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশের হাতে তুলে দিয়ে নয়

সাধন কুমার পাল

বোদেশ্বরী মন্দির।

।। এক ।।

গত ৩ মার্চ ২০১৪, বাংলাদেশের 'দিনাজপুর নিউজ'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে চোখ আটকাল। এতে লেখা হয়েছে, 'পুরাণ প্রবাদের গল্পগাথায় ও ঐতিহ্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ জেলার অন্যতম উপজেলা বোদা। এখানে রয়েছে পুরাণ প্রবাদের মন্দির বোদেশ্বরী। প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে জানা যাচ্ছে, বোদা অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত জনপথ। খৃস্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে পঞ্চগড়-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ওই সময়কার শিলালিপি ও ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী অহমিয়া দস্যুদের আক্রমণের ভয়ে তুর্কী ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে বোদেশ্বরীর কাছে প্রবাহিত খরস্রোতা করতোয়া পাড়ি দেওয়ার সময় সাঁতারে অনভ্যস্ত তুর্কী সেনাদের অনেকে ঘোড়া-সহ ডুবে মারা যায়। বেঁদে যাওয়া অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে অহম দস্যুদের ভয়ে খিলজী করতোয়া তীরের জঙ্গলে একটি ভগ্ন মন্দিরে আশ্রয় নেয়। পরে তিনি দেখতে পান এটি একটি দুর্গ। গবেষকদের মতে এটিই বোদেশ্বরী গড়। পাল রাজারা মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বোদেশ্বরীতে নির্মাণ করেন দুর্গ। নদী পেরোতে গিয়ে ঘোড়া-সহ সৈন্য মারা পড়ায় মাড়েয়া ঘাট ও বড়শশী ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে করতোয়া নদীর এই ঘাট এখনও ঘোড়ামারা ঘাট নামে প্রসিদ্ধস হয়ে আছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সতীর পায়ের গোড়ালি পতিত হয় এই স্থানে যা বোদেশ্বরী নামে পরিচিত। পৌরাণিক কাহিনী সূত্রে গাথা সতীর অঙ্গের নামে প্রতিষ্ঠিত হয় বোদেশ্বরী মন্দির। পাঁচশত বৎসরের পুরনো এই মন্দিরটি। প্রতিদিন দেশি বিদেশি অনেক পর্যটক এখনে বেড়াতে আসে।'

স্কন্দ পুরাণ উদ্ধৃত করে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদন বলছে, ''...বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের স্পর্শে দেবীর দেহ ৫২টি খণ্ডে খণ্ডিত হয়।... মহামায়ার দেহের খণ্ডিত অংশ যেখানে পড়েছে তাকে পীঠ বলা হয়। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের মতো বোদেশ্বরী মহাপীঠ আরেকটি শক্তিপীঠ। উক্ত মন্দিরের নাম অনুসারে বোদা উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। করতোয়া নদীর তীর ঘেষে নির্মিত বোদেশ্বরী মহাপীঠ মন্দিরটি এখন প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের নিদর্শন বহন করে।''

ডঃ রেবতী মোহন লাহিড়ী 'জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাস' নিবন্ধে লিখেছেন, ''বোদো জাতি ক্রমশ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, বর্তমান কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর জনপদ-সহ একদা ময়মনসিংহ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এক বিরাট জনগোষ্ঠী এক সময়ে বিরাট রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল— বিস্তৃত ছিল বর্তমান অসমের পূর্বসীমা হইতে বাংলা ভূ-খণ্ডের করতোয়া নদীর পূর্বতীর অবধি।'' করতোয়া তীরবর্তী প্রাচীন নগরীটি বোদোদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই এর নাম বোদা। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, 'CHAKLAJATA ESTATES' গ্রন্থে লিখেছেন, ''Near the centre of the main fortification lies the temple of Bodeswari, an image of goddess Bhagabati, whose worship is said to have been established by bodho raja; This temple has been twice rebuilt by the maharajas of Coochbehar.''

দুই

ইতিহাস বলছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার মধ্যে অবস্থিত ভারতীয় ছিটমহল শালবাড়িতে অবস্থিত মাতা বোদেশ্বরী মন্দিরটি সপ্তদশ শতকে কোচ নৃপতি প্রাণনারায়ণ কর্তৃক পুনর্নির্মিত

হয়। রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ এই মৌজার ৫০০ বিঘা জমিতে শাল গাছ লাগিয়েছিলেন। যার থেকেই গ্রামের নাম শালবাড়ি। এই শালবাড়ি ছিটে আশেপাশে রয়েছে কাজলদিঘী, নটকটকা, নাজিরগঞ্জ, বেউলাডাঙ্গা, ছিট দৈখাতা, পুটিমারির মতো বেশ কিছু ছিটমহল। এই ছিট গুচ্ছের মোট আয়তন চার হাজার একরের বেশি। এই ছিটগুচ্ছের মধ্যে নাজিরগঞ্জ ছিট ও ভারতের মূলভূখণ্ডের জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির সীমান্তের ৭৭৪নং পিলার সংলগ্ন এলাকার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মাত্র আড়াই বিঘা জমির একটি চিলতে। এই আড়াই বিঘা জমির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পঞ্চগড় জেলা সদর অভিমুখী সড়ক। অর্থাৎ এই সড়ক পেরুলেই ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে ভারতীয় ছিটগুচ্ছগুলিতে পা রাখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে ৭৭৪নং পিলার ও ৫নং গেটের পাশাপাশি ৭২২নং পিলার ও ৬নং গেট থেকে নাকি নাজিরগঞ্জ ছিটের দূরত্ব আড়াই বিঘা জমির চেয়েও কম।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুভব এরকম যে, বাংলাদেশের এই আড়াই বিঘা জমির জন্যই যেন বিরাট আয়তনের এই ভারতীয় ছিটগুচ্ছ আজ অন্ধকারময় ভূদ্বীপে পরিণত। ওই ছিটের বাসিন্দা ভারতীয়দের দেশের মূল ভূখণ্ডে আসা মানা। এই হতভাগা ছিটের বাসিন্দা ভারতীয়দের দেশের মূল ভূখণ্ডে আসা মানা। এই হতভাগা ছিটের বাসিন্দা ভারতীয়দের সঙ্গে বন্দিনী হয়ে আছে কোটি কোটি হিন্দুর পরম শ্রদ্ধার স্থান পুরাণ প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ, সেই সঙ্গে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বোদেশ্বরী মন্দিরও। ৭৪-এর ইন্দির-মুজিব চুক্তি অনুসারে ছিট বিনিময় হলে এই তীর্থস্থান চিরতরে চলে যাবে বাংলাদেশে। যেহেতু এখনো ছিটমহল বিনিময় হয়নি সেজন্য এই ছিটগুচ্ছ, সেই সঙ্গে পুরাণ ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ বোদেশ্বরী মন্দিরকে ভারতের দিকে রেখে ছিট বিনিময় করা যায় কিনা, ছিটমহলগুলিতে ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের যৌথ স্বার্থবাহী বিশ্ব ঐতিহ্যের সাক্ষীস্বরূপ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যায় কিনা, এই ধরনের প্রস্তাব কতটা বাস্তবসম্মত ও দেশ বিদেশের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সাপেক্ষে কতটা যুক্তিসঙ্গত তা অবশ্যই তা একবার খোলা মনে বিবেচনা হওয়া দরকার।

তিন

'বারলে নাসাও' ও 'বারলে হারটং' দুটি অবিচ্ছেদ্য যমজ শহর। প্রথমটি নেদারল্যান্ডের আর দ্বিতীয়টি বেলজিয়ামের। এই যমজের অবস্থান নেদারল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে। অবিচ্ছেদ্য হলেও শহর দুটির জন্য রয়েছে পৃথক আইন, পৃথক মেয়র, পৃথক পুলিশ প্রশাসন ও পৃথক কর ব্যবস্থা। স্ব স্ব পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য উভয় দেশের পৃথক পতাকা উড়ছে নিজ নিজ এলাকায়। তবুও শহর দুটিকে অবিচ্ছেদ্য যমজ বলা হচ্ছে। কারণ, শহরে ঘুরতে থাকলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড বা পরিচয় জ্ঞাপক পতাকা না দেখে বুঝার উপায় নেই কোন দেশে আছি। এমনও রাস্তা আছে যার অর্ধেক নেদারল্যান্ডের বাকি অর্ধেক বেলজিয়ামের। রাস্তার মাঝখানে যোগ চিহ্নের মতো সীমানা পৃথককারী চিহ্ন দেওয়া আছে। অর্থাৎ এক পা নেদারল্যান্ডে আরেক পা বেলজিয়ামে রেখে স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। এই শহরে এমন কিছু ঘর আছে যার সামনের দরজা নেদারল্যান্ডে পিছনের দরজা বেলজিয়ামে। আইন হচ্ছে সামনের দরজা যে দেশের মধ্যে পড়েছে পুর কর সেই দেশকেই দিতে হবে।

বেলজিয়ামের ভূমির ২৬টি অংশ নিয়ে গঠিত বারলে হারটং পুর এলাকা। যার মধ্যে ৪টি বেলজিয়ামের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বাকি ২২টি নেদারল্যান্ডের বারলে নাসাও মধ্যে অবস্থিত। অর্থাৎ নেদারল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত বেলজিয়ামের ২২টি ছিটমহল (enclave) ও মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত সীমান্তের চারটি এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে বারলে হারটং। নেদারল্যান্ডের মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত বেলজিয়ামের ছিটমহলগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক শপিং মল সমৃদ্ধ আলো ঝলমলে এই যমজ শহর। দুদেশের সীমান্তের এই অকৃত্রিম জটিলতা চাক্ষুষ করতেই এখানে ছুটে আসেন দেশি বিদেশি ভ্রমণ পিপাসুরা। বাণিজ্যিক কারণেই হয়তো ভ্রমণ পিপাসুদের মন ভরাতেই গড়ে উঠেছে আলো ঝলমলে আধুনিক সুযোগ সুবিধা যুক্ত এই অবিচ্ছেদ্য যমজ শহর।

বারলের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা শুনে প্রথম শ্রোতার মনে এরকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে ছিটমহল মানেই যেন স্বপ্নের জগৎ। তবে এটা সত্য ছিটমহল বলেই বারলে মানুষ টানতে পারছে। দুদেশের অকৃত্রিম সীমান্ত জটিলতাই বারলের সম্পদ। এই সম্পদকে মূলধন করেই বারলে আজ আধুনিক শহর। ছিটমহল বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন অনুসারে সীমান্ত জটিলতার নিরিখে ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি বিশ্বের বিস্ময়। সেদিক থেকে বারলের স্থান ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির পরে। বারলের দৃষ্টান্ত ধরে বলা যায় যদি সুযোগ করে দেওয়া যায় তাহলে সীমান্তের এই অকৃত্রিম জটিলতা দেখতে ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলগুলিতে ভ্রমণ পিপাসুদের ঢল নামবে।

চার

সীমান্ত জটিলতার নিরিখে বারলের চেয়েও অনেক বেশি সম্পদশালী হয়েও ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলগুলি এখনো অন্ধকারময়, বিভিষিকাময় এক জাগ্রত দুঃস্বপ্নের জগৎ। কারণ এই একবিংশ শতাব্দীতেও ছিটমহলের বাসিন্দারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, নিরাপত্তার মতো রাষ্ট্র প্রদত্ত ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ওঁদের নিজ রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে যাওয়ার অনুমতি নেই। এ যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এক ভিন্ন গ্রহের ভিন্ন জগৎ।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই অন্ধকার? কার দোষে হাজার হাজার ছিটমহলবাসী আজও সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে? সে প্রশ্নে আসার আগে খুব সংক্ষেপে এই অন্ধকারময় জগৎটির গোড়ার কথায় একবার চোখ রাখা যাক। ঐতিহাসিক কারণে এক সময় দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের কিছু বিচ্ছিন্ন গ্রাম মুঘল শাসিত বাংলার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই গ্রামগুলি রাজাওয়ারা নামে পরিচিত ছিল। আবার মুঘল শাসিত বাংলার কিছু গ্রাম কুচবিহার রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল।

স্থানীয় ভাবে এই গ্রামগুলি মোগলান নামে পরিচিত ছিল। মুঘলদের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি সত্ত্ব লাভের পর ও স্বাধীন কোচবিহার রাজ্য বৃটিশ শাসকদের করদ মিত্র রাজ্যে পরিণত হওয়ার পরও মোগলান ও রাজাওয়ারা-গুলির পূর্ব অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। বৃটিশ অধীনস্থ এলাকায় রাজাওয়ারা নামে পরিচিত গ্রামগুলিতে কোচবিহার রাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকার ফলে এগুলি কোচবিহারের ছিটমহলে পরিণত হয়। কোচবিহার রাজ্যের ভারত ভুক্তির পর এই ছিটমহলগুলি সাবেক পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমণির হাট ও কুড়িগ্রাম জেলার মধ্যে থাকা কোচবিহার জেলাভুক্ত ভারতীয় ছিটমহল হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

আগের পরিসংখ্যান বলছে, ভারতীয় ছিটমহলের সংখ্যা ১২৬টি এবং বাংলাদেশের ছিটের সংখ্যা ৯৫টি। কিন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালের যৌথ সমীক্ষায় ভারতের ১১১টি (মোট আয়তন ১৭১৬০.৬৩ একর) এবং বাংলাদেশের ৫১টি (মোট আয়তন ৭১১০.০২ একর) ছিট বিনিময় যোগ্য বলে নির্ধারিত হয়। ২০১১ সালের বিশেষ জনগণনা অনুসারে ১১১টি ভারতীয় ছিটের মোট জনসংখ্যা ৩৭৩৩৪ জন ও ৫১টি বাংলাদেশি ছিটের মোট জনসংখ্যা ১৪২১৫ জন।

'ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী' —এই ইস্যুতে প্রবল জনআন্দোলন ও অন্যান্য কারণে সাবেক পাকিস্তানকে ছিটমহলের জমি হস্তান্তর করার জন্য সংবিধান সংশোধন করেও ১৯৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তি রূপায়ণ করে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করা যায়নি। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ১৯৭৪ সালে নতুন করে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও ভারতের দিকে একই আওয়াজ ওঠে যে, ছিট বিনিময়ের জন্য এই চুক্তি ভারতের স্বার্থ-বিরোধী। এই চুক্তিতেও নেহরু-নুন চুক্তির মতো ফুটে উঠল ভারতীয় নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও বাস্তব বোধের অভাবের চিত্র।

নেহরু-নুন চুক্তির ২ (১০) ধারায় বলা হয়েছে---'Exchange of old Coochbehar enclaves in Pakistan and Pakistan enclaves in India without claim to compensation for extra area going to Pakistan, is agreed to.' ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা- মুজিব চুক্তির প্রথম অনুচ্ছেদের ১২নং ধারায় বলা হয়েছে, 'The Indian enclaves in Bangladesh and Bangladesh enclaves in India should be exchanged expediously, excepting the enclaves mention in paragraph 14 with out claim to compensation for the additional area going to Bangladesh.' —দুটো চুক্তিতেই without claim to compensation for extra বা additional area কথাটি উল্লেখ রয়েছে। কোন পরিস্থিতি বা বাধ্যবাধকতার জন্য এমন একটি চুক্তি করতে হলো যাতে বাড়তি জায়গার বিনিময়ে কোনো ক্ষতিপুরণ চাওয়া হবে না, এমনটা ভারতের তরফে মেনে নিতে হয়েছে? সীমান্ত বরাবর সমপরিমাণ ভূখণ্ড বিনিময় করে অথবা তিনবিঘার মতো করিডরের সাহায্যে কিছু ভারতীয় ছিটমহলকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের ভূখণ্ডজনিত ক্ষতি না হওয়া বা কমিয়ে আনা যেতো। ভারতের তরফে এরকম প্রয়াস কি আদৌ কখনো হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তাহলে তা সম্ভব হলো না কেন? না, এই সমস্ত প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

পাঁচ

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না থাকার জন্যই ১৯৯২ সালে এই চুক্তির অংশ বিশেষ অর্থাৎ তিনবিঘা করিডরের মাধ্যমে বাংলাদেশের দুটি বড় ছিট দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতা যুক্ত করে রূপায়িত করতে গেলে প্রবল জন-আন্দোলন আছড়ে পড়ে। লালকৃষ্ণ আদবাণী, সুষমা স্বরাজের মতো বিজেপি'র কেন্দ্রীয় নেতারাও তিনবিঘা হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে তিনবিঘায় এসেছিলেন। সে সময় ক্ষমতাসীন সিপিএম ক্যাডারবাহিনী, পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর সাহায্যে বলপূর্বক সেই আন্দোলনকে প্রতিহত করে দুজন আন্দোলনকারীকে শহিদ বানিয়ে তিনবিঘা করিডর বাংলাদেশকে হস্তান্তর করতে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভারতের ১১১টি ও বাংলাদেশের ৫১টি ছিট বিনিময় করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভারতকে দশ হাজার একর বাড়তি জমি বাংলাদেশকে দিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়াও ভারতকে বইতে হবে উদ্বাস্তুর বোঝা। কারণ এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটের বাসিন্দাদের ভারতে নাগরিকত্ব ছাড়াও ভারতের ১১১টি ভারতীয় ছিটের (ছদ্মবেশি বাংলাদেশি দখলদার ছিটের বাসিন্দারা বাংলাদেশে থাকতে চাইলেও) প্রকৃত বাসিন্দাদের মূল ভূখণ্ডে পুনর্বাসন দিতে হবে। এই বাড়তি জমির জন্যই অন্য রাষ্ট্রকে ভূমি হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে এতদিন রুখে দাঁড়িয়েছে বিজেপি'র মতো সর্বভারতীয় দল সহ বেশ কিছু আঞ্চলিক দল।

এতদিন বিরোধী দল হিসেবে তিনবিঘা হস্তান্তর ও বাড়তি জমি হস্তান্তরের তীব্র বিরোধিতা করে এখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসা বিজেপি বাংলাদেশকে বাড়তি জমি দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধনের পথে হাঁটবে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে ছিটমহল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগে দুদেশের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কিছু বিকল্প পথের সন্ধান হতে পারে। যেমন, স্বার্থের ভারসাম্যে ক্ষতিগ্রস্ত ভারত ৭৪-এর ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি বাতিল করে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে নতুন করে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিতে পারে। কিংবা এই চুক্তির সঙ্গে সংযোজন সংশোধন করে এমন ব্যবস্থা করা যাতে ছিট বিনিময় হলে ভারতের ভূমিগত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা যায়। যেমন এক, তিনবিঘা করিডর বিলোপ করে আঙ্গারপোতা দহগ্রাম ভারতের দিকে রেখে ছিট বিনিময় করা। এতে ভারতের তরফে জমির পরিমাণ সংক্রান্ত ক্ষতির পরিমাণ যেমন কমবে তেমনি সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের উদ্বেগ কমবে। দুই, তিনবিঘার অনুকরণে

ভারতীয় জনগণের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে শালবাড়ি ছিটের মধ্যে অবস্থিত শক্তিপীঠ বলে খ্যাত বোদেশ্বরী মন্দিরটিকে ভারতের দিকে রাখার জন্য আড়াই বিঘা করিডর ও স্বল্প আয়তনের জোংরা করিডর বা অনুরূপ করিডর দিয়ে ভারতের বেশ কিছু ছিট গুচ্ছকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ভূমির পরিমাণ সংক্রান্ত ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে এনে ছিট বিনিময় করা।

সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে এটা বলতে হবে যে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দুদেশের স্বার্থের ভারসাম্যের ঘর্ষণে অসহায় ছিটমহলবাসীকে নিষ্পেষিত হতে দেওয়াটা অন্যায়। অথচ সেই অন্যায়টি হয়ে আসছে বছরের পর বছর ধরে। তথ্য বলছে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত ভারতীয় ছিটের বাসিন্দারা এদেশের বৈধ নাগরিক হিসেবে মূল ভূখণ্ডে শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা, গণবণ্টন ব্যবস্থা, ভোটাধিকার-সহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। ১৯৫৮ সালের পর থেকে এই সমস্ত সুযোগ ক্রমশ কমতে থাকে। প্রথমেই কোপ পরে ভোটাধিকারের উপর। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের পর ভারতীয় ছিটের বাসিন্দারা মূল ভূখণ্ড থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ২০০৪ সালে ১১৫নং, ১১৯নং ও ১২১নং বাঁশকাটা ছিটের চারজন বাসিন্দাকে মাথাভাঙ্গা ব্লক প্রশাসন পঞ্চায়েত হিসেবে মনোনীত করে। পঞ্চায়েতের দেওয়া শংসাপত্র দেখিয়ে এই ছিটের বাসিন্দারা ভারতের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াত করতে পারতেন। ২০০৬ সালের পর সীমান্তরক্ষী বাহিনীর স্থানীয় কমান্ডারের নির্দেশে সে সুযোগও রদ হয়ে যায়। এর পরও অনেকেই লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজের দেশে অর্থাৎ ভারতের মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছেন। তবে সেটা বাংলাদেশিদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে, চৌদ্দ পুরুষের ভিটে ছেড়ে, সর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে, উদ্বাস্তু হয়ে।

ছয়

ছিট বিনিময় কঠিন হলেও ছিটমহলের বাসিন্দা অসহায় মানুষগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে মানবিকতার খাতিরে দু'দেশের মানুষের জন্য নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার বিনিময় হতেই পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও এটা সম্ভব। এছাড়া শুধুমাত্র ছিটের বাসিন্দাদের জন্য আবেদনের ভিত্তিতে বিশেষ ধরনের পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা তো বর্তমান স্থিতাবস্থাকে ব্যাহত না করেও করা যেতে পারে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের দুর্গম এলাকার মানুষের কথা ভেবে সীমান্ত হাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেঘালয়, ত্রিপুরার মতো দুর্গম এলাকার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে সীমান্ত হাটগুলি বসানো হয়ে থাকে। উভয় দেশের মানুষ পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই নিজ নিজ দেশের নাগরিক পরিচয়পত্র দেখিয়ে এই হাটগুলিতে কেনাবেচা করতে পারে। একটি রিপোর্ট বলছে— ২০১১-১২ অর্থবর্ষে এই সীমান্ত হাটগুলিতে শুধুমাত্র বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে হওয়া লেনদেন ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

ছিটমহলগুলি সবই সীমান্ত লাগোয়া। সীমান্ত হাটের অনুকরণে ছিটমহলগুলিতেও দু'দেশের যৌথ ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। সমস্ত ছিটে না হলেও কিছু নির্বাচিত ছিটগুচ্ছ প্রতি একটি সীমান্ত-হাট গড়া যেতে পারে। যাতে কিনা শুধুমাত্র ছিটের বাসিন্দাদেরই ব্যবসার অধিকার থাকবে। এতে ছিটের বাসিন্দাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধও কমবে।

বর্তমান স্থিতাবস্থাকে বজায় রেখে কিছু ছিটকে বারলের অনুকরণে ভ্রমণ পিপাসুদের দর্শনীয়স্থলে পরিণত করা যেতে পারে। তথ্য বলছে,বাংলাদেশের ১৯টি ছিট আছে যেগুলির অবস্থান ভারতীয় ছিটের ভিতরে। আমার ধারণা 'ছিটের মধ্যে ছিট' অর্থাৎ 'বাংলাদেশের মধ্যে ভারত' কিংবা 'ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ' এই ধরনের স্লোগানই পর্যটক টানার পক্ষে যথেষ্ট। এর মধ্যে এমন ছিট আছে সীমান্ত জটিলতার নিরিখে যার আকর্ষণ বারলের থেকে অনেক বেশি। যেমন, ভারতীয় ছিট বালাপাড়া খাগড়া বাড়ির মধ্যে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিট উপেনচৌকি ভজনী। এই উপেন চৌকি ভজনীর মধ্যে আবার এক একরের কম আয়তন বিশিষ্ট ভারতীয় ছিট দহলা খাগড়া বাড়ি অবস্থিত। অর্থাৎ 'ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ তার মধ্যে আবার ভারত'।

বারলের মতো সীমানা চিহ্নিত করে এই ধরনের ছিটগুলিকে সীমান্ত হাটেরই আরেকটু উন্নত রূপ আধুনিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুললে শুধুমাত্র ভারত বাংলাদেশ নয় এগুলি যে সমগ্র পৃথিবীর ভ্রমণ পিপাসুদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই ধরনের টুরিস্ট স্পটকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে তুলে ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীর নজির হিসেবে রেখে দিয়ে ছিট বিনিময় করা যেতে পারে। এতে দু'দেশেরই অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। কুচবিহার জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশি ছিট মশালডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত ২.৬১০ একর আয়তনের ভারতীয় ছিট মনসর শেওড়াগুড়ি। এখানেও একই রকম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সবমিলে বলা যায়, সদিচ্ছা থাকলে ভারত-বাংলাদেশের ছিটগুলিকে চলমান অভিশপ্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করে বারলের মতো আলো ঝলমলে আশীর্বাদে পরিণত করা যেতে পারে। ৭৪-এর ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুসারে ছিট বিনিময় নিয়ে ভারতে যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে, আড়াইবিঘা করিডরের সাহায্যে শালবাড়ি লাগোয়া ছিটগুচ্ছকে ভারতের দিকে রেখে, মাতা বোদেশ্বরী মন্দির খ্যাত তীর্থক্ষেত্রকে ভারতের দিকে রেখে, সেই সঙ্গে উপরে উল্লেখিত কিছু ছিটকে কেন্দ্র করে যৌথ পর্যটনের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে, ছিট বিনিময় করলে আশা করা যায় ভারতবাসীর সেই অসন্তোষ পরম সন্তোষে বদলে যাবে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

এড্‌স আক্রান্তদের ঘর ‘পালবী’

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রের পনঢরপুরে থাকেন গৃহবধূ মঙ্গলাতাঈ। নিজের কোনো কাজে নিকটবর্তী এক গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানেই শুনলেন খাটালের পাশে দুটো শিশুকন্যা কয়েকদিন ধরে পড়ে আছে। খবর নিয়ে জানলেন শিশুদুটির বাবা-মা'র এডস্‌ রোগে মৃত্যু হয়েছে, শিশুদুটিও এডস্‌ রোগে আক্রান্ত। তাই বাড়ির লোকেরা এখানে ফেলে গিয়েছে। রাস্তার লোকেরা দূর থেকেই খাবার ছুড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মঙ্গলাতাঈ সব জেনেশুনেও বাচ্চাদুটিকে নিজের সঙ্গে পনঢরপুরে নিয়ে আসেন।

সেই শুরু। পনঢরপুরে আজ এড্‌স রোগাক্রান্ত বালক-বালিকাদের জন্য মঙ্গলাতাঈ-এর সামাজিক সংস্থা ‘পালবী’ একটি পরিচিত নাম। সেবার জন্য মঙ্গলা শাহা আজ পনঢরপুরে

বালক-বালিকাদের সঙ্গে মঙ্গলাতাঈ।

মঙ্গলাতাঈ নামেই পরিচিত। এড্‌সগ্রস্ত ওই দুই বালিকার দেখাশুনা ও চিকিৎসার জন্য পালবী-র শুরু। টিনের তৈরি দুটি ঘরে শুরু করা সংস্থা আজ অনেক বড় হয়েছে। এখন পনঢরপুর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ‘পালবি’র নতুন বাড়ি হয়েছে। এখন ৪ মাস থেকে ১৬ বছরের ৪০ জন বালক-বালিকা ও পাঁচ মহিলাকে নিয়ে পালবী-র সংসার। মঙ্গলাতাঈ পরম মমতায় এদের দেখাশুনা করেন। এদের কাছে তিনি এখন তাঈ অর্থাৎ ‘মা’।

এড্‌স নিয়ন্ত্রণে আনার এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়নি। এড্‌স সংক্রামক ব্যাধিও নয়। কিন্তু লোকের মনে এই রোগ সম্পর্কে ভয় থাকায় রোগীকে ছুঁতেও ভয় পায়। এড্‌স সংক্রমিত বাবা-মা'র সন্তানও এড্‌স আক্রান্ত হয়। এজন্য এরকম শিশুদের সমাজ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মঙ্গলাতাঈ-এর বিশ্বাস, কোনো না কোনোদিন এড্‌স রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার হবে আর আক্রান্ত বাচ্চাগুলি আবার অন্য অসুস্থ বাচ্চার মতোই সুস্থ হয়ে রোগমুক্ত সাধারণ জীবন ফিরে পাবে। এই আশায় তিনি এড্‌স পীড়িত বালক-বালিকাদের লালন পালন করছেন। তাঁর সংস্থায় তিনি সাধারণ শিশুদের মতোই তাদের বড় হওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন।

‘পালবী’-র দিনচর্যা সকাল সাড়ে পাঁচ থেকে শুরু হয়। প্রথমেই প্রার্থনা। তারপর যে বালক-বালিকা খুবই দুর্বল তাদের রোজ সকালে গোমূত্র খাওয়ানো ও শরীরে মাখানো হয়। এর পরিণামও খুব ভালো পাওয়া যায়। সকালে যোগাসনের পর পৌষ্টিক খাবার দেওয়া হয়। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত পড়াশুনা চলে। দুপুর ১২টায় ভোজনের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। যারা খুবই দুর্বল দুপুরে ভোজনের পর কিছু সময় বিশ্রামে থাকে। বালক-বালিকাদের শারীরিক ক্ষমতার কথা খেয়াল রেখে তাদের রুচি অনুসারে যে কোনো কাজ দেওয়া হয়। বিকালে সবাইকে খেলতে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সামান্য জলখাবারের পর কিছু সময় টিভিতে মনোরঞ্জনের কিছু দেখানো হয়। তারপরেই রাতের খাবার। সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর ‘অগ্নিহোত্র’ অর্থাৎ হোম করা হয়। প্রতি বছর এই বালক-বালিকাদের একবার দূরে কোথাও ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হয়।

উল্লেখনীয় যে, মঙ্গলাতাঈ-এর এই প্রচেষ্টা সমাজে খুব ভালো প্রভাব ফেলেছে। এখানকার কর্মচারীরা নামমাত্র পারিশ্রমিকে কাজ করেন। কর্মচারীরাও ‘পালবী’-র সম্পর্কে সমাজের লোকের কাছে বলে তাদের যুক্ত করার চেষ্টা করেন। মহারাষ্ট্রের অনেক ব্যক্তি এই সংস্থায় নিয়মিতভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকেন। স্থানীয় যুবকরা পালবী-তে এসে বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলাধুলা করে সময় কাটান। ‘‘এই সেবাকাজের প্রেরণা কীভাবে পেলেন?’’ —উত্তরে মঙ্গলাতাঈ জানালেন— ‘‘আমার মা আমাকে বলেছেন সমস্ত শিশুকে মেয়েদের সন্তানরূপে দেখতে হয়। তাই পরিত্যক্ত শিশুদুটিকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে হওয়ার তাদের তুলে নিয়ে আসি। তাই মা'ই আমার প্রেরণাদাত্রী।’’ তিনি আরো জানান— ‘‘আমার মেয়ে ডিম্পল আমাকে এই কাজে খুবই সহযোগিতা করে থাকে। স্থানে স্থানে পথনাটিকা করে জনগণকে আর্থিক সহায়তা দানের আহ্বান জানায়।’’ ডাঃ শীতল শাহা তাঁর ডাক্তারখানায় ‘পালবী’-র বালক-বালিকাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে থাকেন। আয়ুর্বেদ ডাক্তার সমীর জমদগ্নি ও ডাঃ রণদিভেও পালবী-তে চিকিৎসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলাতাঈ উৎসাহের সঙ্গে জানালেন— ‘‘তিন একর জমি কেনা হয়েছে, আরো একটা ভবন তৈরি হবে।’’ ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ধর্মমাত্রই বিশেষ বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। প্রাচীন ঈজিপ্টে ধর্ম মৃত্যুকেন্দ্রিক। পার্শিয়ায় শুভ-অশুভের রহস্য ভেদই ধর্মের মূল লক্ষ্য এবং খৃষ্টধর্মের পরিত্রাতা যীশুর ভালবাসার মাধ্যমে উদ্ধারে বার্তা প্রচার। একমাত্র হিন্দুধর্মেরই উদ্দেশ্য চরম বৈরাগ্য ও মুক্তিলাভ, জাগতিক কোন বিষয় নয়।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পান-সুপারিতে কতটুকু ক্ষতি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক পান-সুপারি বা জর্দার রসায়ন এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো। পানে রয়েছে কিছু টারফেনলস। পান খাওয়ার কারণে ঠোঁট ও জিহ্বায় দাগ পড়ে যায়। দাঁতে প্রায় স্থায়ী দাগ পড়ে যায়। অনেকেই ভেবে থাকেন জর্দা বা তামাক পাতা ছাড়া শুধু সুপারি দিয়ে পান খেলে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। সবার জানা প্রয়োজন, তাইওয়ানের অধিকাংশ মানুষ টোব্যাকো সামগ্রী ছাড়া সুপারি দিয়ে পান খেয়ে থাকেন। তাইওয়ানে এক গবেষণায় দেখা গেছে, সুপারি নিজেও ক্যান্সার সৃষ্টি করে থাকে অর্থাৎ সুপারিতে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে। চুনে রয়েছে প্যারাঅ্যালোনফেনল, যা মুখে আলসার সৃষ্টি করতে পারে। এ আলসার ধীরে ধীরে ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে পারে। সুপারি চুনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এরিকোলিন নামক একটি নারকোটিক এলকালয়েড উৎপন্ন করে। আবার অনেকের মতে, সুপারিতে এমনিতেই এরেকোলিন এনকালয়েড বিদ্যমান থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এরিকোলিন প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। এ কারণেই চোখের মণি সঙ্কুচিত হয় এবং লালা নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, চোখে জল পর্যন্ত আসতে পারে। তবে এক খিলি পান-সুপারিতে এসব পরিবর্তন দেখা নাও যেতে পারে। কাঁচা সুপারি উত্তেজক হিসাবে কাজ করে। সুপারিতে রয়েছে উচ্চমাত্রার সাইকোঅ্যাকটিভ এলকালয়েড। এ কারণেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কাঁচা সুপারি চিবালে শরীরে গরম অনুভূত হয়, এমনকী শরীর ঘেমে যেতে পারে। সুপারিতে রয়েছে এরিকেন ও এরকোলিন এলকালয়েড, যা উত্তেজনার দিক থেকে নিকোটিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্য এলকালয়েডগুলোর মধ্যে রয়েছে এরিকাইডিন, এরিকোলিডিন, গুরাসিন বা গুয়াসিন, গুভাকোলিন ইত্যাদি।

সুপারি খেলে তাৎক্ষণিক যেসব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো হলো— (ক) অ্যাজমা বেড়ে যেতে পারে; (খ) হাইপারটেনশন বা রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে; (গ) টেকিকার্ডিয়া বা নাড়ির স্পন্দনের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে অস্থিরতা অনুভূত হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদে সুপারি খেলে ওরাল সাবমিউকাস ফাইব্রোসিস হতে পারে। ক্যান্সারের পূর্বাবস্থা বা স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমাও হতে পারে। মূলত আমাদের দেশে মুখের ক্যান্সারের মধ্যে স্কোয়ামাস সেল কারসিনোমা বেশি দেখা যায়। আমাদের দেশে পানের সঙ্গে সাদাপাতা বা জর্দা ব্যাপকভাবে গৃহীত হচ্ছে। জর্দা পছন্দ মতো না হলে অনেকেই আবার মান-অভিমানও করে থাকেন। ক্যান্সার গবেষণায় আন্তর্জাতিক সংস্থা আই এ আর সি-র মতে, যারা পানের সঙ্গে তামাক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাদের সাধারণের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি সম্ভাবনা থাকে ওরাল ক্যান্সারের রোগী হওয়ার ক্ষেত্রে। পানের সঙ্গে যে ধরনের তামাক সামগ্রী গ্রহণ করা হয় তা খুবই বিপজ্জনক। তুলনামূলকভাবে এরিকোলিন এলকালয়েডের চেয়ে তামাক সামগ্রীর এলকালয়েড ও নিকোটিনের অধিক মাত্রায় নেশা ও বিষাক্ত ধর্ম থাকে। তাই জর্দা যত সুগন্ধি মিশ্রিত হোক না কেন, তা জীবনের সৌরভ ধীরে ধীরে বিলীন করে দেয়। পানের সঙ্গে যে খয়ের খাওয়া হয় তা খুব কম সময়ের মধ্যে মুখ লাল হয়ে যায়। খয়ের তৈরি করা হয় অ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু নামক বৃক্ষের কাঠ থেকে। খয়ের এসট্রিনজেন্ট হিসেবে কাজ করে মুখের অভ্যন্তরের মিউকাস মেমব্রেনকে সঙ্কুচিত করে। অনেকেই বিচিত্র পদ্ধতিতে পানসেবন করে থাকেন। কেউ কেউ পানের ছোবড়া ও রস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেন। পান খাওয়ার এক পর্যায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ পানের কিছু অংশ গালের এক পাশে রেখে আবার কিছুক্ষণ পর খেতে দেখা যায় অনেকটা জাবরকাটার মতো। অনেকেই এ ভাবে পান গালের এক পাশে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদের ক্ষেত্রে গালের এক পাশে আলসার-সহ ক্যান্সার পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। পানের নেশা থেকে মুক্তিলাভের আশায় অনেকেই প্যাকেটজাত পানমশলা কিনে চিবাতে থাকেন। কিন্তু ধারণাটি আসলে সম্পূর্ণ ভুল। পানমশলায়ও ক্ষতিকর উপাদান বিদ্যমান, যা আলসার সৃষ্টি করে থাকে। পানমশলার সঙ্গে মেনথল মিশিয়ে মুখের অভ্যন্তরে ঠাণ্ডা অনুভূতির সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হচ্ছে। সবশেষে শুধু এটুকু বলা যায়, সব ধরনের নেশা থেকে মুক্তি পেতে আপনাকে সুন্দর জীবনবোধের অধিকারী হতে হবে। সুন্দর জীবনবোধের মাধ্যমে আপনিও পারেন সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে। ■

ড. শ্যামাপ্রসাদ জন্মজয়ন্তী পালন ও রক্তদান শিবির

শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব্ কালচার তাজপুর, হাওড়া-র উদ্যোগে ৫ ও ৬ জুলাই ইন্সটিটিউটের প্রসাদতীর্থ সভাগৃহে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৪ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। ৫ জুলাই সভাগৃহের সমাবেশে ড. মুখোপাধ্যায়ের জীবনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, সহ সভাপতি, রাজ্য বিজেপি প্রভাকর তেওয়ারী; সুব্রত দে, গীতা রায় ও প্রবীর রায় প্রমুখ রাজ্য ও জেলা বিজেপি নেতা। প্রত্যেক বক্তাই তাঁর নিজ বক্তব্যে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ড. মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত পথ কত প্রাসঙ্গিক তার বিশ্লেষণ করেন। বক্তাগণ ড. মুখোপাধ্যায়ের কর্মজীবনের বিশদ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর স্বদেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য সংহতি রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞার প্রতি আলোকপাত করেন।

৬ জুলাই সকালে ড. মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ ও চারাগাছ রোপণ করে বর্ষব্যাপী বৃক্ষ রোপণ তথা অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সকাল ১০টায় শুরু হয় ৩০তম বাৎসরিক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। শিবিরের হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিস রায় দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ৭০ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা-সহ মোট ৮০ জন রক্তদান করেন। ১৯৮৫ সাল হতে ধারবাহিক ৩০ এবং ৬ জুলাই রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়ে আসছে।

বিকালে প্রসাদ স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের বর্তমান প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি সহযোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, সংস্থার অছি-পরিষদের প্রবীণ সদস্য অনিল রীত।

মঙ্গলনিধি

গত ৩ জুলাই দক্ষিণ মালদহের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী স্বয়ংসেবক বিষ্ণুপদ রায়ের ভ্রাতা কৃষ্ণপদ রায়ের শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদানের কার্যক্রমে তাঁর পিতা রাখালচন্দ্র রায় এবং মাতা বীণাপানি রায় মঙ্গলনিধি প্রদান করেন প্রবীণ প্রচারক রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের হাতে। মালদা বিভাগ কার্যবাহ রামেশ্বর পাল উপস্থিত সকলের সামনে মঙ্গলনিধির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস, ড. তুষারকান্তি ঘোষ, ড. প্রদ্যোত ঘোষ, প্রবীর কুমার মিত্র প্রমুখ।

সমাবেশ সমাচার

মেলায় সেবা বিভাগের জলসত্র

স্নানযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এই বছরেও আসানসোল জেলার ফরিদপুর খণ্ডের ইছাপুর গ্রামে গঙ্গাপূজার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহু পুরনো ও ওই অঞ্চলের সব থেকে জনপ্রিয় এই মেলায় প্রচুর জনসমাগম হয়। এবারেই প্রথম এই মেলায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা বিভাগের প্রচেষ্টায় একটি জলসত্র-সহ স্টল খোলা হয়। পরিশুদ্ধ জল পরিবেশন করা হয় জলসত্র থেকে। এছাড়া ওই অঞ্চলের ১৬টি সেবা প্রকল্পের প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর নির্মিত চালের পাপড় (কুরকুরে) এবং ডালের বড়ি বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। ৮ জুন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষক নিতাই হালদার উপস্থিত থেকে সেবা ভারতীর এই কাজের প্রশংসা করে বলেন, এই প্রথম জলসত্রের ব্যবস্থা এই মেলাতে দেখা গেল। সেবা প্রকল্পের বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া এবং সেলাই কেন্দ্রে, অঙ্কন কেন্দ্রে ও ওই অঞ্চলের একমাত্র কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরাসরি ভর্তি হওয়ার জন্য জনগণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

সংশোধনী

স্বস্তিকা-র (৭ জুলাই, ২০১৪) ৬৬ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠায় সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর লেখা 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রগতির গতি' শীর্ষক প্রবন্ধটির তৃতীয় স্তম্ভে ১৭ লাইনে অর্থাৎ ড. শ্যামাপ্রসাদ ও দুর্গাচরণ (দুর্গাদাস নয়) ব্যানার্জী এবং ২১ লাইনে 'জনার্দন সাধু'র স্থলে 'জনার্দন সাউ' পড়তে হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

অখিল ভারতীয় মারওয়াড়ী সম্মেলন

গত ৭ জুলাই কলকাতার বালীগঞ্জের বিবেকানন্দ হলে অখিল ভারতীয় মারওয়াড়ী সম্মেলনের এক আলোচনাসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রামঅবতার পোদ্দার। সভায় সীতারাম শর্মা বলেন— বিবাহ-সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও মঙ্গল অনুষ্ঠানে যেভাবে ককটেল পার্টির প্রচলন বাড়ছে তাতে সমাজের কমবয়সীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পূজ্য পণ্ডিত শ্রীকান্ত শর্মা (বালব্যাস) বলেন, এগুলি আমাদের সংস্কার নষ্ট করে দেওয়ার কারণ রূপে দেখা যাচ্ছে। আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করতে হবে। সংস্কৃত থাকলেই সংস্কার থাকবে। মালীরাম শাস্ত্রী বলেন— মদ্যপানে পাপ বৃদ্ধি হয়। নরক ভোগ করতে হয় এর পরবর্তী জীবনে মনুষ্যেতর যোনিতে জন্ম নিতে হয়। আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন নন্দলাল রুঙ্গাটা, হরিপ্রসাদ কানোড়িয়া, প্রহ্লাদ রায় আগরওয়াল। সভা পরিচালনা করেন রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় হরলালকা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাধারণ সম্পাদক শিবকুমার লোহিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কৈলাশপতি তোদী, ঘনশ্যাম শোভাসরিয়া, নন্দকিশোর আগরওয়াল, ভানীরাম সুরেকা, শ্যামলালাল ডোকানিয়া, ওম লভিয়া, নন্দলাল সিংহনিয়া, নারায়ণ আগরওয়াল-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ধন্বন্তরী সেবাযাত্রা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের ২২টি প্রত্যন্ত অঞ্চলে টানা পাঁচদিন বিনামূল্যে বিভিন্ন চিকিৎসা শিবির করে দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন দেশ-বিদেশের ১৩৬ জন ডাক্তার ও মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীরা। গত ২৪ জুন থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচদিনের ওই চিকিৎসা শিবিরকে ২২ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল, ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও) এবং সেবা ভারতী ইন্টারন্যাশনাল-এর যৌথ উদ্যোগে 'ধন্বন্তরী সেবাযাত্রা-১১' নামে পাঁচ দিনের এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সহযোগিতা করে বনবন্ধু পরিষদের গুয়াহাটি শাখা। গত ২৯ জুন ডাউন টাউন হাসপাতালের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত শিবিরের সমারোপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ডাক্তার ও মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের অনুভব ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে নানা তথ্য তুলে ধরেছেন। অরুণাচল প্রদেশের ভারত-চীন সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের পাহাড়ি বাসিন্দাদের রোগব্যাধির অজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন রাঁচী মেডিক্যাল কলেজের নীলম রাই। ভুটান সীমান্তে আয়োজিত শিবির থেকে ফিরে ডাঃ রমেন সরকার জানান, ওইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ নাকি রোগ কী জিনিস এবং এজন্য কোন ধরনের ওষুধপত্র ব্যবহার করতে হয় জানেন না। অথচ তারা বিচিত্র ধরনের পেটের রোগ, চর্মরোগ, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি নানা রোগের শিকার। ডাঃ টি কে শর্মার পৌরোহিত্যে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন প্রাক্তন আই এ এস আধিকারিক তথা অসম সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব জ্যোতি প্রসাদ রাজখোয়া। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন ডাঃ গৌতম গোস্বামী, ডাঃ ধনেশ্বর কলিতা, সুরেন্দ্র তালখেধর, গুরুশরণ প্রসাদ, এন এম ও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সতীশ মিধা ও সংগঠন সম্পাদক ডাঃ সিবি ত্রিপাঠী। উত্তর-পূর্বের ২২টি শিবিরে প্রায় ৩০ হাজার রোগী ধন্বন্তরী সেবাযাত্রার সুবিধা পেয়েছেন। শিবিরে অংশ নিতে ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা, দুবাই থেকেও ডাক্তাররা আসেন বলে জানা গেছে।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী ও স্বস্তিকা-র দীর্ঘদিনের পাঠক দেবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৫ জুলাই বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপের কাছে রামদাসপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত রোগে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। তাঁর পুত্র আমেরিকা প্রবাসী কাঞ্চন ভট্টাচার্য ও প্রত্যুষ ভট্টাচার্য দু'জনেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

"ধর্ম হলো রক্ষিত দল,
মৃত্যু হলো সংরক্ষিত দল
জন্ম হলো ধর্মীয় দল।"

শ্রী শুভঙ্কর মিশ্র (ব্যানার্জি)

২১ জুলাই, ২০১৪
কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

এক অভাবনীয় মঞ্চগাথা

‘উপনিষদ—এক অনুভব’

বিকাশ ভট্টাচার্য

গীতা, উপনিষদের বাণী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পথচলার এক মহার্ঘ পাথেয়, এক উপলব্ধি। দুঃখের কথা, আজকের ভোগবাদী জীবনদর্শনে অভ্যস্ত তরুণ প্রজন্ম যেন এর থেকে মুখ ঘুরিয়ে আছে। আশার কথা, সম্প্রতি বিড়লা সভাঘরে ‘অনামিকা’ এক অভাবনীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপনিষদের সেই চিরন্তন বাণীকে সঙ্গীত, নৃত্য, ভাষ্য ও চিত্রাবলীর মাধ্যমে আমাদের

সামনে তুলে ধরল। উপনিষদের এক একটি গভীর উপলব্ধি সহজ ভাষ্য-সহ সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো— যা আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও দু-ঘণ্টা সভাঘরে বসে দেখল। এখানেই ‘অনামিকা’র সাফল্য। এই অনবদ্য অনুষ্ঠানের রূপকার বিমল লাঠ জানালেন, আজকের ভোগসর্বস্ব জনজীবনে উপনিষদের বাণী অনেক সমস্যা থেকে আমাদের মুক্তি দেবে। কিন্তু আমাদের সময় নেই ধৈর্য ধরে তার পাঠোদ্ধার করার। তাই এই আয়োজন! গান আমাদের ভালো লাগে। নাচও আমাদের মনকে ভরিয়ে দেয়। তাই এর সমন্বয়ে সহজসরল ভাষ্যের সঙ্গে আমরা তুলে ধরেছি আজকের দর্শক-শ্রোতার সামনে, ‘উপনিষদ— এক অনুভব’। বলতে দ্বিধা নেই, যে চ্যালেঞ্জ বিমল লাঠ ও তাঁর সাংস্কৃতিক মঞ্চ ‘অনামিকা’ গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁরা একশোভাগ সফল।

উপনিষদের গভীর দর্শন মঞ্চে রূপ দিতে যে ভারতের ধ্রুপদীনৃত্য ও সঙ্গীতই একমাত্র উপযুক্ত— তা বিমল লাঠ বুঝেছেন এবং ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকলার যতগুলি ধারা আছে, অর্থাৎ ভরতনাট্যম্, ওড়িশি, কথক, কুচিপুড়ি, কথাকলি, মোহিনী আট্টম— সবকটি নৃত্যশৈলীই মঞ্চে এসেছে। সঙ্গে রাগাশ্রয়ী গান। নৃত্যের এক একটি ধারার গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে মঞ্চে এসেছেন। সমস্ত নৃত্যকলার সমন্বয় করেছেন ওড়িশি নৃত্যের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী অলকা কানুনগো। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মলি রায়, অভয় পাল, শ্রীপর্ণা বসু প্রমুখ নৃত্যগুরু।

সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন চন্দন রায়চৌধুরী। বিভিন্ন রাগের আধারে গানগুলির সুরারোপ করেছেন তিনি। সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন প্রবীণ বাদ্যযন্ত্রীরা। যেমন, এন. শঙ্কর, কালিন্দীচরণ পারিধা, বিশ্বজিৎ পাল, কুঞ্জ সিং এবং কলামণ্ডলম্ গোপম। গানগুলি মূল সংস্কৃত কঠোপনিষদ ও ঈষাবাস্যোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। অনুবাদ করেছেন প্রবীণ গীতিকার শিব ওমঅম্বর, রামেশ্বর মিশ্র, পণ্ডিত ছবিনাথ মিশ্র, দয়াকৃষ্ণ বিজয়বঙ্গীয় এবং বিমল লাঠ স্বয়ং। ভাষ্য ও সঙ্গীত সবই ছিল হিন্দীতে। প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে ছিল ছবি। যেগুলি এঁকেছেন সুনীল বিশ্বকর্মা ও ঋতা ঝুনঝুনওয়ালা। পেছনের পর্দায় ছবিগুলি প্রজেক্টারের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছিল। যাতে দর্শকদের আরও আগ্রহ বাড়ে।

প্রথম নিবেদন ছিল কঠোপনিষদের শান্তির বাণী, ‘ওঁ সহনা ববতু, সহনৌ ভুনক্তু... ইত্যাদি। পরবর্তী গান ‘দো পক্ষী’ মুণ্ডকোপনিষদ থেকে নেওয়া শ্লোক। গানটি ভৈরবীতে নিবদ্ধ। কুচিপুড়ি নৃত্যশৈলীতে এটি নিবেদন করেন মাধুরী মজুমদার, শুভা জেনা ও অমরজিৎ শীল। রাগ কলাবতীতে নিবদ্ধ গান ‘শ্রেয় আউর প্রেয়’ কঠোপনিষদ থেকে অনুবাদ করেছেন বিমল লাঠ। ভরতনাট্যম গুরু অভয় পাল ও তাঁর শিষ্যরা এটি মঞ্চে নিবেদন করেন। ‘অবনীত আত্মা’ মোহিনী আট্টমে রচিত এই নৃত্যশৈলী মলি রায়ের নির্দেশনায় তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা নিবেদন করেন। মিঞা কি মল্লার রাগে নিবদ্ধ গানটি অনবদ্য। ‘প্রভু প্রসস্ত অন্তর্যামী’ গানটি রাগ বৈরাগীতে রচনা। ওড়িশি নৃত্যগুরু অলকা কানুনগোর পরিচালনায় এটি মঞ্চে রূপ দিয়েছেন অর্পিতা ভেঙ্কটেশ, উজর্ষি বসাক, প্রিয়াঙ্কা রায়। এছাড়া মণিপুরী কথক প্রভৃতি নৃত্যশৈলীতেও মঞ্চস্থ হয়েছে বেশ কিছু অনুদিত শ্লোক।

সবশেষে ‘অনামিকা’ ও বিমল লাঠকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমন একটি অভাবনীয় প্রযোজনা উপহার দেওয়ার জন্য। ■

শব্দরূপ-৭১৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

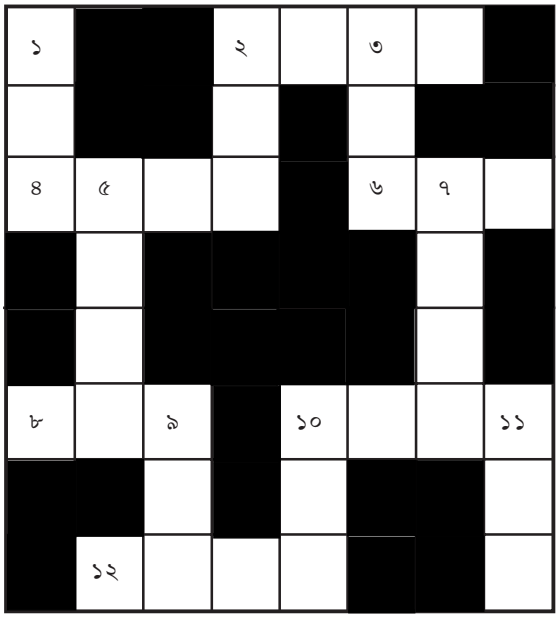

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. রাবণমহিষী, ৪. 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ—'; প্রণাম, ৬. মাথাকাটা ভূত বিশেষ, ৮. 'কিরাতার্জুনীয়' কাব্যরচয়িতা, ১০. একটি তপোলব্ধা অলৌকিক বিদ্যা, এই বিদ্যা অধিগতা হলে অনশনজনিত ক্লেশ অনুভূত হয় না, ১২. কৌড়ি, কড়ি।

উপর-নীচ : ১. গাভীরূপ সম্পদ, ২. গঙ্গার বাহন, ৩. প্রাচীরের গায়ে পোঁতা গোঁজা; নাগদণ্ড, ৫. পুরাতন মতে এক এক মনুর অধিকারকাল; বর্তমানে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, ৭. সংসারে অত্যাসক্ত, ৯. শাখা, ১০. যম; নাশক, ১১. 'এ কি — পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে'।

শব্দরূপ ৭১২ ত্রুটিপূর্ণ থাকায় প্রকাশ করা হলো না
—সম্পাদক

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭১৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ আগস্ট, ২০১৪ সংখ্যায়

নেত্রদান মহাদান

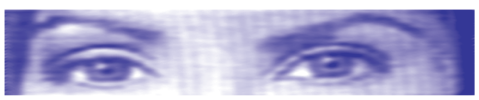

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ১

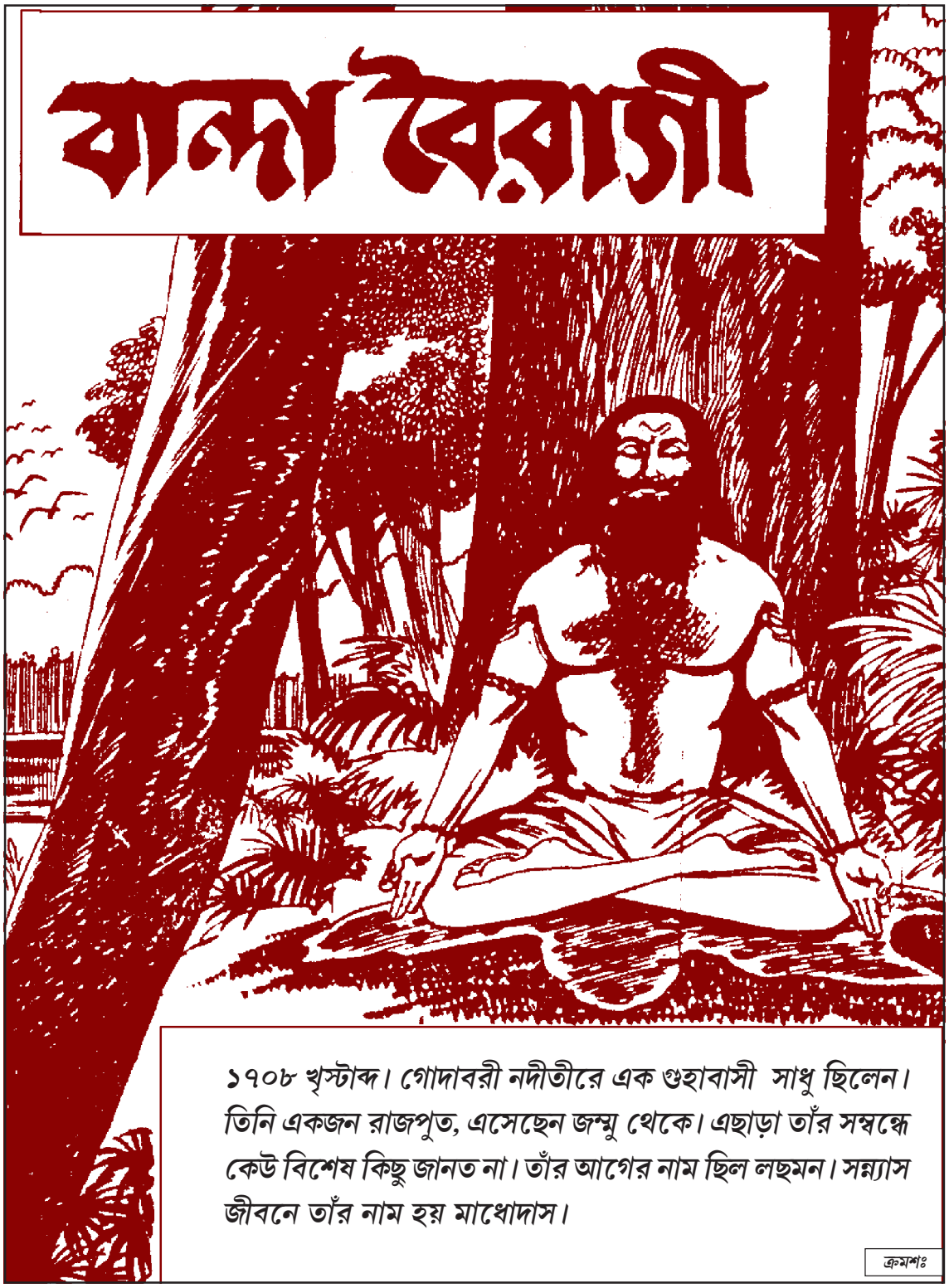

আপনার এলাকায় স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রতিনিধির নাম ঠিকানা

পশ্চিমমেদিনীপুর

- **লক্ষ্মীকান্ত দাস**
  খড়্গপুর
  ৯৯৩৩৯৫৩২৫৯
- **মদন রুহিদাস**
  কেশারী
  ৮১৪৫৩৩৩৫০৯
- **অমলেন্দু দাস**
  ঝাড়গ্রাম
  ৯৮৩২২৮৩০০১
- **কে সি দাস**
  করকই
  ৯৮০০২৪৩০৬৬
- **নিত্যানন্দ দত্ত**
  মাদপুর
  ৯০০২৬৪৩৪৪২
- **সমীরণ গোস্বামী**
  মেদিনীপুর শহর
  ৯৮৫১৩৯৩৯৪৮
- **মনোরঞ্জন দাস**
  গড়বেতা
  ৯৫৬৪৪৫১৬৯৯
- **কৃষ্ণপ্রসাদ বসু**
  নারায়ণগড়
  ৭৬৯৯০৪৩৯৯০

পূর্বমেদিনীপুর

- **কালীপদ মাইতি**
  লালপুর
  ৯৬৪৭১৯৫৩০৬
- **নিমাইচন্দ্র জানা**
  তমলুক
  ৯৯৩২৭৬৪৫৪৭
- **বিজন পাণিগ্রাহী**
  মহিষাদল
  ৯৯৩৩০৯৩৬৭৬
- **নিত্যানন্দ পণ্ডা**
  এগরা
  ৯৭৩৪৪১৪৪০২
- **প্রশান্ত কুমার রাণা**
  কমল পুর
  ৯৪৩৪০৮৬২৮১
- **কমলেশ জানা**
  দেভক
  ৯৬৩৫৭৪৭৮৯৮
- **সুখেন্দু বেরা**
  কাঁথি
  ৯৪৩৪২৫৮৪৩৫

হাওড়া

- **দেবপ্রকাশ দে**
  মুন্সীরহাট
  ৯৫৬৩৫২০২৪৮
- **তাপস ভট্টাচার্য**
  উদয়নারায়ণপুর
  ৯৭৩২৪৩৭৯৩৩
- **কৃত্তিবাস জানা**
  উলুবেড়িয়া
  ৯২৩৯৭২৪৭০৩
- **নরেন্দ্র কুমার সিংহ**
  বাকসারা
  ৯৪৭৫৫০-৫৪৯৮
- **গণেশ চট্টোপাধ্যায়**
  আমতা
  ৯৯৩৩৪৪৯৩৬০
- **কাঞ্চন ভট্টাচার্য**
  হাওড়া মহানগর
  ৯৮৩৬৬২২০৯৫
- **কালীপদ ভট্টাচার্য**
  হাওড়া মহানগর
  ৯৮৩১৬৩৩৩৭৮
- **গোবিন্দ নন্দী**
  হাওড়া মহানগর
  ৯৮৩১৪০৮৩৬৯

হুগলী

- **সঞ্জয় ত্রিপাঠী**
  রিষড়া
  ০৩৩-২৬৭২৭২১২
- **অদ্বৈতনাথ দে**
  হরিপাল
  ০৩২১২-২৮১০১৫
- **আশুতোষ দে**
  হরিপাল
  ৯৪৭৪০৯৭২৩৩
- **রামকৃষ্ণ শর্মা**
  পাণ্ডুয়া
  ৮৯৪৫৯৯৫৩৪৩
- **তারক দেব**
  ধানিখালি
  ৮৯২৭০৩০৮৮৬
  ৮৫০৯২৬৬৯২৯
- **শিবাশিস বেজ**
  আরামবাগ
  ৯৬৪১৩৩৪১৮২
- **রাজকুমার দাস**
  আরামবাগ
- **প্রদীপ দত্ত**
  জাঙ্গীপাড়া
  ৮৫১৩০৩১১৮৪
- **স্বপন বিশ্বাস**
  চুঁচুড়া
  ৯৩৩১৬৫৮৩৩১
- **অনুপ দাস**
  মশাট
  ৯৮৩১৮৬৯১০৩
- **তপন মুখার্জী**
  সোমড়া
  ৯৪৭৪৪৬৩৬৭০

কলকাতা

- **প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**
  পাটুলি
  ৮৯০২২২৯৪৪২
- **বাদল মণ্ডল**
  বাঘাযতীন (দক্ষিণ)
  ৮১০০৪৩৮৭৬৮
- **চিত্তরঞ্জন পাত্র**
  বিধান সরণী
  ৯৬৭৪৫১৫৫২৩
- **পবন চৌধুরী**
  বেহালা
  ৯৪৩৩৬৫৭২৯
  ৯৬৭৪৫১৬৫০৬
- **আর সি ভাণ্ডারী**
  ক্যামাক স্ট্রিট
- **নকুল সাহা**
  তালতলা, ধর্মতলা
- **তপন কাহার**
  শ্যামবাজার
  ৯১৬৩২১১৪১৯
- **মন্টু দাস**
  বেলেঘাটা
  ৯৮৭৪৯৯৩৮৭৫
- **কমল কেডিয়া**
  বড়বাজার
- **জীবনময় বসু**
  বাগবাজার
  ৯৯০৩১১৯১৩৫
- **ধ্রুব বসু**
  পশ্চিমপুটিয়ারী
  ৯৪৭৭০৬৪১৫০
- **অশোক মুখার্জী**
  ম্যুর অ্যাভিনিউ, টালিগঞ্জ
  ৯৪৭৭৪৫৮৩৩২
- **দেবাশিস দাস**
  ট্যাংরা
  ৯৮৮৩০৮৩৯৪৯
- **অচ্যুত কুমার গাঙ্গুলী**
  হরিদেবপুর
  ০৩৩-২৪০২১২৩৪
  ৯৯০৩৪০১৬৮৩

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
21 July - 2014

SURYA

EVERY CITY EVERY HOME

The biggest Indian MultinatiOnal SURYA showcases the best of lighting solutions, unmatched range of fans and quality pipes that touches the live of people from EVERY CITY EVERY HOME

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008 (INDIA)
Tel. : +91-11-25810093-96 Fax : +91-11-25789560
Email : consumercare@sroshni.com Website : www.surya.co.in

দাম : ১০.০০ টাকা